الإيمان بالقضاء والقدر

ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد

লেখক: মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-হামাদ

تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

সম্পাদনা:
আল্লামা শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আযীয ইবনে বায

نقله إلى اللغة البنغالية/محمد عبد الله شاهد

অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
(সাবেক দাঈ, অনুবাদক ও গবেষক আল-জুবাইল ইসলামি সেন্টার, সৌদি আরব
মুহাদ্দিছ: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া, ঢাকা।)

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রধান অফিস:
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)
www.maktabatussunnah.org

শাখা অফিস:
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬

প্রকাশ: জুন ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ (একশত আশি) টাকা

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
❖ ভূমিকা	৮
❖ তাক্বদীর সম্পর্কে আলোচনা করার বিধান	১৬
❖ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ ও ফলাফল	২২
❖ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করার সুফল	২২
❖ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক হওয়ার দলীলসমূহ	৪৫
❖ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সালাফদের কিছু উক্তি	৫৩
❖ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের দাবি	৫৪
❖ তাক্বদীরের স্তরসমূহ	৫৬
❖ বান্দার কাজ-কর্মের স্রষ্টা কে?	৭০
❖ তাক্বদীরের প্রকারভেদ	৭৩
❖ তাক্বদীরের বিষয়ে বান্দার করণীয় কী?	৮০
❖ তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু সংশয় এবং তার জবাব	৮২
❖ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা কি তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা করার পরিপন্থি?	৮৪
❖ তাক্বদীর দ্বারা দলীল পেশ করে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া কিংবা আমল বর্জন করার পরিণতি	৯০
❖ তাক্বদীর দিয়ে কখন দলীল পেশ করা বৈধ?	৯৬
❖ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা	৯৮
❖ ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শারঈয়ার মধ্যে পার্থক্য	১০০
❖ তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু সংশয় ও তার নিরসন	১১০
❖ ইবলীস সৃষ্টির কারণ ও হিকমত	১১৭
❖ বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি করা ও তা দ্বারা মানুষকে আক্রান্ত করার হিকমত	১২১
❖ পাপাচার সৃষ্টি ও নির্ধারণ করার হিকমত	১৩২
❖ আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন এবং যা কিছু ফায়ছালা করেছেন তার	

সবগুলোর প্রতিই কি সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক? ১৩৯
❖ স্থিরীকৃত তাক্বদীর ও ঝুলন্ত তাক্বদীর ১৪১
❖ মানুষ কি তার কাজে বাধ্য না স্বাধীন? ১৪৪
❖ তাক্বদীরের মাসআলা বুঝতে যারা ভুল করেছে ১৫৩
❖ উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বপ্রথম তাক্বদীর অস্বীকারকারী ১৭৬
❖ তাক্বদীরের ব্যাপারে কিছু ভ্রান্ত ফির্কার পরিচয় ১৭৮
❖ কাদারীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের কিছু ঘটনা ও তাদের সাথে কিছু কথোপকথন ১৮৫

অনুবাদকের কথা

ঈমানের ছয়টি রুকনের মধ্যে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ষষ্ঠ রুকন হলেও এর গুরুত্ব ও মর্যাদা সীমাহীন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্ধারণ, ফায়ছালা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়গুলো তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে গণ্য। কুরআনের অধিকাংশ আয়াতের সম্পর্ক তাক্বদীর ও সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে। কিন্তু বেশিরভাগ মুসলিম এ বিষয়টি সম্পর্কে তেমন জ্ঞান রাখে না। আমাদের বাংলাভাষী মুসলিমদের অবস্থা আরো বেশি শোচনীয়। সাধারণ মুসলিম তো দূরের কথা, আলিমগণও এ বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। অথচ তারা ঈমানের অন্যান্য রুকন সম্পর্কে এবং ইসলামী শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান রাখেন। এর কারণ হলো তাক্বদীরের বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম। আলিমদের কাছে বিষয়টি যেখানে সূক্ষ্ম ও জটিল, সেখানে সাধারণ মুসলিমদের নিকট এ বিষয়ে জ্ঞান কম থাকারই কথা। তা ছাড়া আমাদের সমাজে ঈমানের রুকনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের বিষয়ে লম্বা আলোচনা হয় না। অথচ ঈমান ও ইসলামের অন্যান্য রুকন সম্পর্কে জানার পাশাপাশি ঈমানের ষষ্ঠ রুকন সম্পর্কে জানা ও আলোচনা করা জরুরী। বিষয়টি জটিল হওয়ার অযুহাতে জানার চেষ্টা সম্পূর্ণ বাদ দেয়া মোটই উচিত নয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের কিতাবগুলো ভালোভাবে পড়লে ঈমানের কোনো রুকন সম্পর্কেই অজ্ঞতা কিংবা ইলমের কমতি থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজের অধিকাংশ আলেম সালাফদের আক্বীদাহ সংক্রান্ত কিতাবগুলো ভালোভাবে না পড়ার কারণেই তারা তাক্বদীরের মাসআলা বেশি একটা বুঝেন না। এ জন্যই তাক্বদীর সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর জবাব হয় এলোমেলো ও অস্পষ্ট। অনেকেই প্রশ্নগুলো এই বলে পাশ কাটিয়ে যান যে, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। তাদের কেউ কেউ আবার এমন জবাব প্রদান করেন, যাতে তাক্বদীর সম্পর্কে সন্দিহান লোকের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পায়। কেউ কেউ বলেন, তাক্বদীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা ও বেশি গবেষণা করা ঠিক নয়। আসলে এ সম্পর্কে বেশি গবেষণা করা ও গভীরে যাওয়া ঠিক নয়; কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর ধারায় ও সালাফদের তরীকায় বিষয়টি সম্পর্কে জানা মোটেই দোষণীয় নয়; বরং প্রশংসনীয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাক্বদীর সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। আল-হামদুলিল্লাহ প্রশ্নকারীগণ জবাবগুলো শ্রবণ করে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ, আমার জবাবগুলো সাধারণত শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুমাল্লাহ এর কিতাবগুলো এবং শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াছ্বেতীয়া ও

শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়াসহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ কিতাব ও মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন ও ইবনে বায রহিমাহুমাল্লাহ এর লেখনীর আলোকেই হতো। আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম, দাঈ ও বক্তা উপরোক্ত লেখকদের কিতাবগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব না দেয়ার কারণে তাক্বদীর সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবগুলো তাদের কাছ থেকে একেবারে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টভাবেই আসছে।

আমাদের বাংলাভাষী মুসলিমদের তাক্বদীর সম্পর্কিত একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বিষয়টি লিখার চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। এরই মধ্যে শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদের কিতাবটি হাতে পেয়ে যাই, যার সম্পাদনা করেছেন সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী আল্লামা ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ। কিতাবটির আরবী শিরোণাম হচ্ছে, الإيمان بالقضاء والقدر. কিতাবটি পড়ার সাথে সাথে বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্বান্ত গ্রহণ করি। কারণ, এর মধ্যে আমাদের বাংলাভাষী মুসলিমদের তাক্বদীর সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবগুলো কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের উক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব, বিভিন্ন মাসআলা ও সমস্যার সমাধান সহজভাবে বুঝার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর উপমা-উদাহরণ ও ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে. যা বিষয়টিকে দিবালোকের মত পরিষ্কার করে দিয়েছে এবং তাক্বদীর সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার সমাধান জ্ঞান ভিত্তিক জবাব দেয়া হয়েছে।

কিতাবটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে ভাবার্থের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে। যেমনটি আমি আমার সব অনুবাদের ক্ষেত্রেই করে থাকি। তবে কিতাবে আলোচিত কিছু প্রশ্নের অনুবাদ করা হয়নি। তার জবাবও দেয়া হয়নি। কারণ, এ প্রশ্নগুলো আরব মুসলিমদের মাঝে দেখা গেলেও বাংলাভাষী মুসলিমদের মাথায় এখনো প্রবেশ করেনি। এ কারণে প্রশ্নগুলো তাদের থেকে এখনো বের হয়নি বলেই মনে হয়। কথায় বলে ঘুমন্ত সিংহকে জাগানো ঠিক নয়। তাই সেগুলো এড়িয়ে চলেছি।

বাংলাভাষী মুসলিমগণ কিতাবটি ভালোভাবে পড়লে আশা করি উপকৃত হবেন। আমার শ্রমও সার্থক হবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং যারা এর সম্পাদনা ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন।

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
২১ রামাযান, ১৪৪২ হিজরী

আল্লামা আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

আমার ভাই ফযীলাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-হামাদ الإيمان بالقضاء والقدر (ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান) নামক যে পুস্তকটি রচনা করেছেন, তা পড়েছি। আমার মতে এটি একটি মূল্যবান এবং উপকারী কিতাব, এর ভাষা সুস্পষ্ট। কিতাবটির বিষয়-বস্তুর প্রতি গুরুত্ব দেয়া জরুরী। এ বিষয়ে গ্রন্থকার যা লিখেছেন, তাতে তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীক প্রাপ্ত হয়েছেন। কিতাবটির উপকারিতা যেন পরিপূর্ণ হয়, সে জন্য আমি এর উপর সামান্য টীকা সংযুক্ত করেছি। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন এর মাধ্যমে মুসলিমদের উপকার করেন এবং লেখককে প্রতিদান বাড়িয়ে দেন, তার এবং আমাদের ইলম ও হিদায়াত যেন আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয়ই তিনি দয়ালু দাতা। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাথীদের উপর ছ্বলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায

সাবেক প্রধান মুফতী রাজকীয় সৌদি আরব

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

দীন ইসলামের মধ্যে القضاء والقدر বা ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা ও বিরাট গুরুত্ব। এটি তাওহীদের কেন্দ্রবিন্দু। এর মাধ্যমে বান্দার তাওহীদ সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় হয়। ইসলামী শরী'আতের হুকুম-আহকাম বা বিধিবিধান আসা শুরু হয়েছে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান দিয়ে এবং সমাপ্তিও হয়েছে এর মাধ্যমেই। ঈমানের রুকনসমূহের মধ্যে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান অন্যতম। এর প্রতি ঈমান বান্দার ইবাদতের মূলভিত্তি।

সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারণ করা আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতার মধ্যে গণ্য। মুমিনগণ আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন। যারা এটিকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাকেই অস্বীকার করে।

কুরআন ও হাদীছে বার বার তাক্বদীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায় পরিণত হয়েছে। শরী'আতের দলীলসমূহ তাক্বদীরের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছে এবং এর প্রতি ঈমান আনয়নকে আবশ্যক করেছে।

আক্বীদাহ বিষয়ে লিখিত কিতাবগুলো তাক্বদীরের মাসআলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে, এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছে, এ ব্যাপারে সন্দেহগুলো দূর করেছে এবং এ বিষয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদ করেছে ও তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ বিরাট সুফল অর্জন করে। তাই এ মাসআলাটির খুব গুরুত্ব ও বিরাট মর্যাদা রয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজের উপর তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

তাক্বদীরের প্রতি কুফুরী করার কারণে এবং তা বুঝার ব্যাপারে বিভ্রান্ত হওয়ার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতে যে দুর্ভাগ্য, দুঃখ-কষ্ট এবং আযাব রয়েছে তাও প্রমাণ করে যে, তাক্বদীরের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অস্বীকার করার কারণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। সুতরাং সঠিকভাবে তাক্বদীরের মাসআলা বুঝা এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এ ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ মানুষ তাক্বদীরের মাসআলায় বিভ্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার শরী'আতগত ও সৃষ্টিগত ফায়ছালার বিরোধিতা করেছে। ফলে তারা তাক্বদীরের উপর ঈমান আনয়ন করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং এর উপকারিতা ও সুফল হারিয়ে ফেলেছে।

القضاء والقدر তথা ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা একটি সৃষ্টিগত বিষয়। জাহেলী যুগে কিংবা ইসলামী যুগে আরবরা তাক্বদীর অস্বীকার করতো না। আরবী ভাষার ইমাম আহমাদ ইবনে ইয়াইয়াহ ছা'লাব সুস্পষ্ট করেই বলেছেন, مافي العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية وأهل الإسلام। সকল আরবই তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগের সকলেই তাক্বদীরের ভালো-মন্দ সবকিছুর প্রতিই ঈমান আনয়ন করেছে।

জাহেলী যুগের কবিতা ও ভাষণ-বক্তৃতার মধ্যেও তারা তাক্বদীর সাব্যস্ত করেছে। তাক্বদীর সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করার সময় তা উল্লেখ করা হবে। তারা তাক্বদীর বিশ্বাস করেছে এবং তা অস্বীকার করেনি। যদিও তাদের বিশ্বাসের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল এবং তাক্বদীদেরর প্রকৃত অবস্থা বুঝার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অজ্ঞতা ছিল।

যুহাইর ইবনে আবু সালমা তার সুপ্রসিদ্ধ মুআল্লাকায় বলেন,

فَلاَ تَكْتُمُنَّ اللهَ مَا فِي نفوسِكُمْ + لِيَخْفَى، وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَمِ

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر + ليوم الحساب اويعجل فينتقم

"তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে তা গোপন করো না। তা যতই গোপন করা হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা জেনে নিবেন।

কেউ গোপনে অপরাধ করলে তাকে অবকাশ দেয়া হবে, আমলনামায় লিখা হবে এবং ক্বিয়ামত দিবসের জন্য সংরক্ষণ করা হবে অথবা তার

আগেই দুনিয়াতে প্রতিশোধ নেয়া হবে। কবি যুহাইর তার মুআল্লাকার অন্যত্র বলেন,

رَأَيتُ المَنايا خَبطَ عَشواءَ مَن تُصِب + تُمِتهُ وَمَن تُخطِئ يُعَمَّر فَيَهرَمِ

আমি মৃত্যুকে কানা উটনীর মত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। এটি যার উপর গিয়ে পড়ে তার মৃত্যু ঘটায় এবং যার উপর পড়তে ভুল করে সে দীর্ঘজীবি হয়ে বৃদ্ধ হয়।

কবি তাক্বদীরকে অস্বীকার না করলেও তাকে এমন কানা বা দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন উটনীর সাথে তুলনা করেছেন, যেটি দিশেহারা অবস্থায় চলাচল করে। তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে যার সাথে ধাক্কা লাগে তাকেই আক্রমণ করে এবং মেরে ফেলে। আর যার উপর পড়তে ভুল করে সে বেঁচে যায়।

তাক্বদীর সম্পর্কে এটি তার মারাত্মক অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির প্রমাণ। কেননা প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত এবং লিখিত আছে। জাহেলী যুগের অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যগ্রন্থে তা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সাবআ মুআল্লাকাতের অন্যতম কবি আমর ইবনে কুলছুম বলেন,

وَإِنَّا سَوْفَ تُدْرِكُنا المَنَايا + مُقَدَّرَةً لَنا وَمُقَدِّرِينا

অচিরেই মৃত্যু আমাদেরকে আক্রমণ করবে। এটি আমাদের জন্য নির্ধারিত এবং আমাদেরকেও এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাহেলী ও ইসলামী যুগের সুপ্রসিদ্ধ কবি লাবীদ ইবনে রাবীআ আল-আমেরী নীল গাভীর সাথে হিংস্র বন্যপ্রাণীর আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে তার মুআলাকায় বলেন,

صادفن منها غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها

নেকড়ের দলটি নীল গাভীর বাচ্চাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে সেগুলোকে ধরাশায়ী করে ফেললো। নিশ্চয়ই মৃত্যুর তীর কখনো ভুল করে না। এখানেও লাবীদ বলেছেন যে, সবার মৃত্যু নির্ধারিত রয়েছে এবং তা যথাসময়েই আগমন করে থাকে। মৃত্যু কখনো সময় হওয়ার আগে কারো উপর ভুলক্রমে আক্রমণ করে না। নির্ধারিত সময়েই প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

"তারপর যখন সেই সময়টি এসে যায় তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্তও আগাতে পারে না, পিছেও যেতে পারে না"। (সূরা আন নাহাল ১৬:৬১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا﴾

"কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে"। (সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৪৫)

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়ে অন্যান্য নাবীর মতই তাক্বদীরের বিষয়টির সর্বোচ্চ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তাক্বদীর এবং অন্যান্য বিষয়ে তার উপকারী বক্তব্যসমূহ সংক্ষিপ্ত; কিন্তু সবকিছুকে শামিলকারী। এ বক্তব্যগুলো অন্তরের রোগ নিরাময় করার জন্য যথেষ্ট। তিনি কখনো তাক্বদীরের মাসআলাসমূহকে এক সাথে একত্র করে বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যগুলো খুব পরিষ্কার। কুরআনে তাক্বদীর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনাগুলো তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

তাঁর ছাহাবীগণ একই পথ অনুসরণ করেছেন, তাঁর নিকট থেকে তাক্বদীরের মাসআলাগুলো শিখেছেন, তাঁর প্রদর্শিত মজবুত পথের অনুসরণ করেছেন এবং তার সরল-সঠিক মানহাজের উপর চলেছেন। তাক্বদীর সম্পর্কে ছাহাবীদের বক্তব্যগুলো পরিষ্কার এবং পরবর্তীকালের লোকদের বক্তব্যের পরিবর্তে সেগুলোই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাক্বদীরের বিষয়ে তাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও উপকারী। কেননা তারা ছিলেন নবুওয়াতের যুগের খুব নিকটবর্তী এবং নবুওয়াতের চেরাগ থেকে তারা সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। নবুওয়াতের চেরাগ থেকে তাদের আলো নির্গত হয়েছে, সমস্ত কল্যাণ উৎসারিত হয়েছে এবং এটিই হিদায়াতের মূলভিত্তি। সুতরাং অন্যদের তুলনায় তাক্বদীরের মাসআলায় তারাই ছিলেন সর্বাধিক বুঝবান এবং সবচেয়ে জ্ঞান সম্পন্ন। তারাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি ঈমানদার এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী সর্বাধিক আমলকারী। ছাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন নাবী আলাইহিমুস সালামের পরে সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু, সবচেয়ে দানশীল এবং সর্বাধিক সাহসী।

অতঃপর ছাহাবীদের পরে উত্তমভাবে তাদের অনুসারী তাবেঈগণ তাদের অনুসরণ করেছেন, তাদের হিদায়াত গ্রহণ করেছেন এবং তারাও সেদিকে

দাওয়াত দিয়েছেন ও ছাহাবীগণ যে পথের উপর ছিলেন তারাও সেখানে পৌঁছেছেন।

তাবেঈদের যুগের পরে এই উম্মতের মধ্যে অন্যান্য উম্মতের ব্যাধি ঢুকে পড়েছে। তারা তাদের পূর্ববতীদের পথ ও রীতি-নীতির অনুসরণ করেছেন। ইসলামী আক্বীদাহ ও দেশগুলোর মধ্যে গ্রীক দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতি, পারস্য কুসংস্কারসহ অন্যান্য অপসংস্কৃতির কালো ছায়া ঢুকে পড়েছে। এর ফলে সর্বপ্রথম বসরা ও দামেস্কে কাদারীয়া মাযহাব অর্থাৎ তাক্বদীর অস্বীকার করার বিদ'আত প্রবেশ করেছে এবং এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম শির্ক অনুপ্রবেশ করেছে। তা হলো তাক্বদীর অস্বীকার করার শির্ক। এটি ছিল ছাহাবীদের যুগের শেষের দিকের কথা। তারা এই বিদ'আতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং তা থেকে ও তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

এর পর আগমন করেছেন সালাফদের আলেমগণ। তারা তাক্বদীর অস্বীকার বিদ'আতটি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, এটি বানোয়াট হওয়ার কথা তুলে ধরেছেন, এর মুখোশ উন্মুক্ত করেছেন এবং এর অসার ভিত্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করেছেন। সেই সঙ্গে তারা এ বিষয়ে মূল সত্যটি প্রকাশ করেছেন, তা প্রচার করেছেন এবং উম্মতকে এদিকে আহব্বান করেছেন।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করা সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত বিষয়। শরী'আতের দলীলগুলো কেবল এটিকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছে এবং পরিষ্কারভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। তবে নিঃসন্দেহে এটি আক্বীদার একটি জটিল ও কঠিন বিষয়। তাই গভীর ব্যাখ্যা করা, এর শাখা-প্রশাখাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা, এতে বেশি বেশি গবেষণা করা এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ ছড়ানো হলে বিষয়টি বুঝা সহজ হওয়ার চেয়ে আরো কঠিন হয়ে যায়। তা আয়ত্ত করাও দুঃসাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং পূর্ব ও বর্তমান কালের মানুষ এটি বুঝতে গিয়ে হয়রান হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যারা এ বিষয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরাফেরা করেছে, প্রতিটি উপায় অবলম্বন করেছে, সংকীর্ণ ও কঠিন পথ অতিক্রম করেছে, এর জ্ঞান অর্জন করার দৃঢ় সংকল্প করেছে এবং এর প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা এতে উপকৃত হতে পারেনি এবং অন্যকেও লাভবান করতে পারেনি। কেননা তারা হিদায়াতের আসল উৎস বাদ দিয়ে অন্যস্থান থেকে তা অন্বেষণ করেছে। তারা শুধু নিজেরা ক্লান্ত হয়েছে, অন্যদেরকেও ক্লান্ত করেছে, দিশেহারা হয়েছে, অন্যদেরকে দিশেহারা করেছে এবং গোমরাহ হয়েছে ও অন্যদেরকেও গোমরাহ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদেরকে তাক্বদীর বুঝার তাওফীক দিয়েছেন। কেননা তারা এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহয় যা এসেছে, কেবল তারই অনুসরণ করে এবং সালাফে ছ্বলেহীনদের পথের অনুসরণ করে। কেননা এই উম্মতের সালাফগণ তাক্বদীরকে যেভাবে বুঝেছে, সেভাবে না বুঝলে এটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়।

এ বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝে তারাই সর্বাধিক ধন্য হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট অহীর চেরাগ থেকে এর শিক্ষা নিয়েছে, স্বীয় ফিতরাত ও ঈমানের দাবিতেই দিশেহারাদের মতামত পরিত্যাগ করেছে, সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্তদের সন্দেহ পরিহার করেছে এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের বাড়াবাড়ি বর্জন করেছে।

এজন্যই দেখা যায় যে, সাধারণত আক্বীদাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তা থেকে বিচ্যুত হওয়া বিশেষ করে তাক্বদীরের মাসআলাকে সঠিকভাবে না বুঝাই পরবর্তী যুগের মুসলিমদের অধঃপতনের সবচেয়ে বড় কারণ।

পৃথিবীতে অগ্রগতি, উন্নতি, সম্মান-মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা বাদ দিয়ে অনেক মুসলিম তাদের অপারগতা, অক্ষমতা ও ধ্বংসের পক্ষে এবং কর্মহীন জীবন-যাপন করার পক্ষে যখন তাক্বদীর দিয়ে খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শন করেছে, তখনই তারা পতনের সম্মুখীন হয়েছে। তারা ভুলে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীর তাঁর অপরিবর্তনীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী চলতে থাকবে, তাতে কোনো রদবদল হবে না এবং কারো প্রতি সৌহার্দ প্রদর্শন করবে না। সে যে কেউ হোক না কেন।

আমরা আশা করি মুসলিম জাতি তাদের গভীর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মানব জাতির নেতৃত্ব ও সংশোধনের দায়িত্ব নিবে এবং বিশ্বের মাঝে তাদের সম্মানজনক স্থান পুনরুদ্ধার করবে। আর এটি পরিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদার দিকে ফিরে আসার মাধ্যমেই সম্ভব। এটিই হলো মুসলিমদের মর্যাদা ও শক্তির মূল উৎস।

তাক্বদীরের বিষয়টি খুব কঠিন এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। আমার ইলমী যোগ্যতাও কম। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব দুর্বল। এটি জেনেও এবিষয়ে লিখার দিকে অগ্রসর হলাম। কারণ যুগযুগ ধরে মানুষের মাঝে তাক্বদীরের বিষয়ে প্রচুর প্রশ্ন রয়েছে, একের পর এক সন্দেহের দ্বার উন্মুক্ত হয়েই চলছে, এতে দিশেহারা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিনা ইলমে এতে মানুষ বেশি বেশি তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে।

তাই আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তেখারা করেছি। অতঃপর এ বিষয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিষয়গুলো একত্র করে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের

সুন্নাত থেকে আলো সংগ্রহ করে, সালাফে ছ্বলেহীনদের বুঝ দ্বারা উপকৃত হয়ে এবং আল্লাহর সাহায্য নিয়ে যতদূর সম্ভব এ বিষয় সংক্রান্ত সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম মাসআলাগুলো সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা এবং এর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করার প্রতি আমার আগ্রহ থেকেই আমি লিখতে অগ্রসর হয়েছি।

এতে আমি মূল সত্যটি বর্ণনা করতে সক্ষম হতে পারলে তা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহেই হবে। আর এতে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি করে থাকি কিংবা নিরর্থক কিছু বলে থাকি, তাহলে তা হবে আমার নিজের নফস্ ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

﴿إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ﴾

"আমি তো আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে চাই। যা কিছু আমি করতে চাই তা সবই আল্লাহর তাওফীকের উপর নির্ভর করে, তাঁর উপর আমি ভরসা করেছি এবং সব ব্যাপারে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি"। সূরা হূদ ১১:৮৮

আর তাক্বদীর সম্পর্কিত আমার এই গবেষণাটির মধ্যে রয়েছে তাক্বদীর সম্পর্কে আলোচনা করার হুকুম। এতে আলোচনা করেছি তাক্বদীর সম্পর্কে সঠিক আক্বীদাহ সম্পর্কে। এতে রয়েছে তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য ও ফলাফল সম্পর্কিত আলোচনা। তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আরো আলোচনা করেছি তাক্বদীর সম্পর্কিত সন্দেহ ও সমস্যাগুলো নিয়ে। আর এতে রয়েছে তাক্বদীরের সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক মাসআলা এবং রয়েছে তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন-আপত্তি ও তার জবাব।

অতঃপর আলোচনা করেছি তাক্বদীর সম্পর্কিত বিভ্রান্তি নিয়ে। তাতে রয়েছে তাক্বদীর বুঝার ক্ষেত্রে মানুষের ভুলত্রুটির আলোচনা এবং রয়েছে তাক্বদীরের মাসআলায় বিভ্রান্তি সম্পর্কিত আলোচনা।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের কাছে অনুরোধ হলো, আমার কাজে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে দয়া করে আমাকে জানাবেন বলে আশা করি। তার জন্য আমি অন্তর থেকে দু'আ করবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

কাজটি শেষ করায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও তাওফীক পেয়ে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন এ কাজটিকে তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার মাধ্যম বানান, এতে আমি যেসব ভুল করেছি,

তা যেন ক্ষমা করেন। আমি প্রার্থনা করছি তিনি যেন পিতৃতুল্য মান্যবর শাইখ আল্লামা আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) কে অপরিমিত বিনিময় ও ছাওয়াব দান করেন। তিনি এই কিতাবটি পড়েছেন এবং বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি কিতাবটির ভূয়শী প্রশংসা করে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তার আমলে বরকত দান করুন এবং খেদমতের মাধ্যমে উম্মতের উপকার করুন।

যেসব সম্মানিত শাইখ, বন্ধু-বান্ধব, তালিব ইলম বইটি প্রকাশ করার কাজে আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং ভুল-ত্রুটি ঠিক করে দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উত্তম বিনিময় দিন এবং তাদের পুরস্কার ও প্রতিদান বৃদ্ধি করুন।

সমকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। তিনি আমাদের নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও ছাহাবীদের উপর ছ্বলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ

তাক্বদীর সম্পর্কে আলোচনা করার বিধান

القضاء والقدر বা ফায়ছালা ও তাক্বদীরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে এমন একটি মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত, যে সম্পর্কে পূর্বকালে ও বর্তমান সময়ে প্রচুর কথা-বার্তা ও বাকবিতণ্ডা হয়েছে: সেটি হলো এক শ্রেণির লোক বলে থাকে যে, তাক্বদীরের মাসআলা সম্পর্কে কথা বলা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত। কেননা এতে সন্দেহ ছড়ায় এবং মানুষ তাতে দিশেহারা হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন জানা যাচ্ছে যে, এতে একদল মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। বিভিন্ন কারণে এই কথাটি একবাক্যে মেনে নেয়া ঠিক নয়।

(১) তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত কেউ ঈমানদার হতে পারে না। সুতরাং আলোচনা না করলে কীভাবে এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে?

(২) ইসলামের ব্যাখ্যায় সর্ববৃহৎ হাদীছে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে জিবরীলের হাদীছ। আর এটি ছিল নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ যুগের ঘটনা। হাদীছের শেষাংশে এসেছে নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনি হলেন জিবরীল। তিনি তোমাদের দীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন।[১]

সুতরাং তাক্বদীর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা দীনের জ্ঞান অর্জন করার অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষিপ্তভাবে হলেও এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব।

(৩) কুরআনুল কারীম তাক্বদীরের বিশদ বিবরণে ভরপুর। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কুরআন নিয়ে গবেষণা করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

“এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ন কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়”। (সূরা সোয়াদ ৩৮:২৯)

---

[১] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের মনের উপর তালা লাগানো আছে"। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৪)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ দিয়েছেন। তা থেকে তাক্বদীরের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতগুলো আলাদা করা হয়নি।

(৪) ছাহাবীগণ নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাক্বদীরের গভীর বিষয়গুলো জিজ্ঞাসা করেছেন। যেমন জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম যখন নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করলো, তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের দীনের বিবরণ পূর্ণভাবে প্রদান করুন, যাতে মনে হবে আমাদেরকে কেবল এই মাত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আজ কী আমল করছি? আমরা কী এমন আমল করছি, যা লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং তাক্বদীরে লিখিত হয়ে গেছে? না কি ভবিষ্যতে আমরা করলে তা লিখা হবে?

তিনি বললেন, না বরং যা লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং যা তাক্বদীরে নির্ধারিত আছে। সুরাকা বললেন, তাহলে আমল করে লাভ কী? নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেকের জন্যই তার আমল সহজ করে দেয়া হবে।[২]

(৫) ছাহাবীগণ তাদের ছাত্র তাবেঈদেরকে তাক্বদীর শিখিয়েছেন। তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এবং তাদের বোধশক্তি যাচাই করার জন্য তাক্বদীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। ছ্বহীহ মুসলিমের বর্ণিত হয়েছে যে, আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী বলেন, আমাকে ইমরান ইবনে হুসাইন জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে বলো, মানুষ আজ যেসব কাজ করছে এবং যা অর্জন করার জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করছে, তা কী তাদের জন্য আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে এবং তাদের উপর পূর্বের নির্ধারণ চালমান রয়েছে? না কি তাদের নাবী তাদের কাছে নতুন জিনিস নিয়ে এসেছেন এবং দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছেন, যা পূর্ব তাক্বদীরে লিখা হয়নি? আমি বললাম, বরং তিনি এমন জিনিস নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ব থেকেই লিখা হয়েছে। আবুল আসওয়াদ বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে এতে কি

[২] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৮, অধ্যায়: ক্বদর বা তাক্বদীর।

যুলুম হয়ে যাচ্ছে না? আবুল আসওয়াদ বলেন, এ কথা শুনে আমি খুব ভীত-সঙ্কিত হলাম এবং বললাম, সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তার মালিকানাধীন। তাঁর কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। বরং বান্দারাই জিজ্ঞাসিত হবে। আবুল আসওয়াদ বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন তখন বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। আমি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্যই এই প্রশ্নটি করেছি।[৩]

(৬) সালাফে ছ্বলেহীনদের ইমামগণ তাক্বদীরের বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা যদি বলি তাক্বদীরের বিষয়ে আলোচনা করা নিষিদ্ধ, তাহলে তাদেরকে গোমরাহ বলা হবে এবং তাদের জ্ঞানীদেরকে মুর্খ সাব্যস্ত করা হবে!

(৭) আমরা যদি তাক্বদীর সম্পর্কে আলোচনা বর্জন করি, তাহলে মানুষ এ বিষয়ে মুর্খতার মধ্যে থেকে যাবে।

(৮) আমরা যদি তাক্বদীর ও তার সুফল সম্পর্কে আলোচনা বর্জন করি, তাহলে অনেক ইলম ও বিরাট কল্যাণ হাত ছাড়া হবে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, এই কথা এবং তাক্বদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার নিন্দায় যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার মাঝে আমরা কীভাবে সমন্বয় করবো? যেমন ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছে এসেছে, তিনি বলেছেন, যখন আমার ছাহাবীদের সমালোচনা করা হয়, তখন তোমরা চুপ থাকো, যখন তারকার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো এবং যখন তাক্বদীর নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন তোমরা চুপ থাকো"।[৪] অনুরূপ আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন যে, তার ছাহাবীগণ তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করছে। এ দেখে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং রাগে তার চেহারা লাল হয়ে গেলো। এতে মনে হলো তার দুইগালে যেন ডালিমের দানা ফোঁড়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি এ বিতর্ক করার আদিষ্ট হয়েছো? আমি কি এ জন্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি? এই তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করার কারণেই অতীতের জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে। আমি

---

[৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৫০, অধ্যায়: ক্বদর বা তাক্বদীর।

[৪] ইমাম তাবারানী: জামেউল কাবীর (১০/২৪৩), আবু নুআইম: হিলইয়াতুল আওলীয়া (৪/১০৮)। শাইখ আব্দুর রাহমান আল-মোবারকফুরী বলেছেন, হাদীছের সনদ হাসান। দেখুন তুহফাতুল আহওয়াযী (৬/৩৩৬)।

তোমাদেরকে দৃঢ় আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করবে না”।[৫]

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব হলো, তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করার নিষেধাজ্ঞা নিম্নিলিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(১) বিনা ইলম ও বিনা দলীলে তাক্বদীর নিয়ে অন্যায়ভাবে বিতর্ক করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

“এমন জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চিয়ই কান, চোখ ও অন্তর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে”। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৩৬) আল্লাহ তা‘আলা অপরাধীদের সম্পর্কে বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾

“কিসে তোমাদের দোযখে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে আমরা ছ্বলাত পড়তাম না। অভাবীদের খাবার দিতাম না। সত্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে মিলে আমরাও রটনা করতাম”। (সূরা মুদ্দাছছির ৭৪: ৪২-৪৫)।

(২) তাক্বদীর সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের ত্রুটিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করা। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের আদর্শের বাইরে গিয়ে মানুষের ত্রুটিযুক্ত বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে তাক্বদীর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা নিষেধ। কেননা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি স্বতন্ত্রভাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অক্ষম এবং মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

(৩) আল্লাহ তা‘আলা যেই তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন, তার সামনে নিজেকে সমর্পন না করা এবং তার সামনে বশ্যতা স্বীকার না করা। কেননা

[৫] তিরমিযী, অধ্যায়: ক্বদর। ইমাম আলবানী ছ্বহীহ সুনান তিরমিযীতে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন, হা/২১৩৩।

তাক্বদীর হচ্ছে গায়েবী বিষয়। গায়েবী বিষয়ের ভিত্তি হচ্ছে মাথা পেতে মেনে নেয়ার উপর।

(৪) তাক্বদীরের লুকায়িত বিষয়গুলো অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা। তাক্বদীর হচ্ছে সৃষ্টির গোপন বিষয়। কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত রাসূল এ সম্পর্কে অবগত নয়। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এটা সম্পূর্ণরূপে জানতে এবং বুঝতে অক্ষম।

(৫) তাক্বদীরের এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে আপত্তি করা অনুচিত। যেমন কেউ কেউ বলে থাকে, কেন আল্লাহ অমুককে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং অমুককে বিপথগামী করেছেন? সমস্ত সৃষ্টির মধ্য থেকে কেন আল্লাহ শুধু মানুষের উপর শরী'আতের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন? কেন আল্লাহ অমুককে ধনী করেছেন এবং কেন অমুককে ফকীর বানিয়েছেন? ইত্যাদি।

কিন্তু জানার জন্য প্রশ্ন করলে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা অজানা রোগের চিকিৎসাই হলো প্রশ্ন করা। যে ব্যক্তি একগুঁয়ে হয়ে প্রশ্ন করবে, শিক্ষার্থী হিসেবে নয়, তার জন্য তাক্বদীর সম্পর্কে কম বা বেশী কোনো প্রশ্নই করা বৈধ নয়।

(৬) তাক্বদীর নিয়ে এমন ঝগড়া করা, যা মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে। তাক্বদীর সম্পর্কে এমন ঝগড়া বিবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হওয়া নিষেধ, যা মানুষকে মতভেদ ও দলাদলির দিকে ধাবিত করে। এটা করা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

কিন্তু বিভ্রান্ত ফির্কার সাথে তর্ক-বিতর্ক করা, তাদের সন্দেহ দূর করা এবং যুক্তি খণ্ডন করা নিন্দনীয় ঝগড়ার আওতাভুক্ত নয়। কেননা এতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাতিল নিপাত যায়।

এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, তাক্বদীর সম্পর্কে আলোচনা করার নিষেধাজ্ঞা সব ক্ষেত্রেই সঠিক নয়। নিষেধ কেবল তখনই হবে যখন এটা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হবে। আর মানুষের বিবেক-বুদ্ধি তাক্বদীর সম্পর্কে যে পরিমাণ কথা-বার্তা আয়ত্ত করতে সক্ষম এবং কুরআন-হাদীছের দলীলের আলোকে যেই পরিমাণ আলোচনা বুঝতে সক্ষম সেই পরিমাণ আলোচনা নিষিদ্ধ নয়। যেমন তাক্বদীরের স্তর সম্পর্কে আলোচনা করা, তাক্বদীরের শ্রেণি বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা, বান্দার কাজ-কর্মের স্রষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা ইত্যাদি। এ সম্পর্কিত আলোচনা খুব সহজ ও সুস্পষ্ট। এ বিষয়গুলো আলোচনা করা দোষণীয় নয়। তবে এ বিষয়গুলো আবার

প্রত্যেকেই বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারে না। তথাপি এমন মানুষও আছে, যারা এগুলো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

তাক্বদীর সম্পর্কে আলোচনা করা সর্বক্ষেত্রে যে নিষেধ নয়, এর সমর্থনে আমরা বলবো যে, ইবনে মাসউদের হাদীছে তাক্বদীর সম্পর্কে চুপ থাকার আদেশ আসার পাশাপাশি ছাহাবীদের সম্পর্কেও চুপ থাকার আদেশ এসেছে। আর ছাহাবীদের সম্পর্কে চুপ থাকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের মধ্যে যেসব দ্বন্দ্ব হয়েছে সে ব্যাপারে চুপ থাকা, তাদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা থেকে চুপ থাকা এবং তাদের মানহানি করা থেকে চুপ থাকা।

ছাহাবীদের ভালো গুণগুলো আলোচনা করা এবং তাদের প্রশংসা করা খুবই ভালো কাজ। এতে কোনো মতভেদ নেই। কুরআনুল কারীমে ছাহাবীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। এমন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছেও ছাহাবীদের প্রশংসা করা হয়েছে।

আর তিরমিযীর যেই হাদীছে এসেছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাক্বদীর সম্পর্কে ছাহাবীদের আলোচনাতে রাগান্বিত হয়েছেন, তার কারণ হলো তারা তাক্বদীর নিয়ে মতভেদ করেছিলো।

সার কথা হলো সঠিক ইলমী পদ্ধতিতে তাক্বদীর নিয়ে আলোচনা করা হারাম বা নিষেধ নয়। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল তাক্বদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে এবং এতে মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। আসল কথা হলো, তাক্বদীর সম্পর্কিত আলোচনা সবার জন্য বিনা শর্তে উন্মুক্ত রাখা যাবে না, আবার একেবারে বন্ধও করা যাবে না। আলোচনা যদি যথাযথ ও সঠিক হয়, তাহলে নিষেধ নয়; বরং কখনো কখনো এ বিষয়ে আলোচনা করা ওয়াজিব হবে। আর তাক্বদীর সম্পর্কে যদি অন্যায় আলোচনা হয়, তাহলে নিষেধ হবে।

القدر বা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ ও ফলাফল

القدر শব্দের আভিধানিক অর্থঃ কোনো জিনিসের পরিমাণ, প্রকৃত অবস্থা ও সর্বোচ্চ সীমাকে কাদার বলা হয়। অতএব প্রত্যেক জিনিসের নির্ধারিত পরিমাপ-পরিমাণকেই ক্বদর বলা হয়। আর পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার অনাদি-অনন্ত ও অবিনশ্বর ইলম ও হিকমতের দাবি অনুযায়ী সমস্ত সৃষ্টির পরিমাপ-পরিমাণ, কাজ-কর্ম, সীমা, গন্তব্যস্থল ইত্যাদি সবকিছু নির্ধারণ করার নামই হচ্ছে ক্বদর বা তাক্বদীর। অন্যভাবে বলতে গেলে ক্বদর হচ্ছে, সমস্ত মাখলুক সম্পর্কে আল্লাহর ইলম ও সেই ইলম অনুযায়ী ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি হবে কলম দিয়ে তা লিখাই হচ্ছে ক্বদর। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পরিমাপ-পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, সৃষ্টি হওয়ার আগেই তিনি সবকিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তিনি অবগত আছেন যে, এগুলো নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত গুণাবলীসহ সংঘটিত হবে। মোট কথা আল্লাহ তা'আলা যেভাবে নির্ধারণ করেছেন সেভাবেই সংঘটিত হবে। আরো সহজভাবে আমরা বলতে পারি যে, ক্বদর বলতে সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর ইলম, ইলম অনুযায়ী সবকিছু লিখা, লিখা অনুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করার মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দান করার ইচ্ছা করা ও সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করার সুফল

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের বিরাট সুফল রয়েছে। এটা মানুষের আচার-আচরণ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে এবং বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে রয়েছে এর বিরাট উপকারিতা। এর সুফলগুলো নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

(১) আল্লাহর ইবাদত বাস্তবায়নঃ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন ঐসব ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সম্পাদন করার আদেশ দিয়েছেন। ঐ মানুষই সর্বোত্তম, যে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে তার রবের সমস্ত ইবাদত বাস্তবায়ন করে, তাঁর রবের যাবতীয় আদেশ মেনে চলে এবং সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকে। তাক্বদীরে প্রতি মানুষের ঈমান যতই বৃদ্ধি পাবে, তার ইবাদত ততই বৃদ্ধি পাবে, তার পূর্ণতা ততই বাড়তে থাকবে, মর্যাদা উন্নীত হবে এবং তার কাছে যা কিছু অপ্রিয় বলে মনে হবে, তার সবই তার জন্য কল্যাণে পরিণত হবে।

(২) শিরক থেকে মুক্তি লাভঃ অগ্নিপূজকরা মনে করে নূর বা আলো হচ্ছে কল্যাণের স্রষ্টা এবং অন্ধকার হচ্ছে অকল্যাণের স্রষ্টা। আর এই উম্মতের কাদারীয়া তথা তাক্বদীর অস্বীকারকারীরা বলে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজ-কর্মগুলো সৃষ্টি করেননি। বরং বান্দারাই বান্দাদের কাজ-কর্ম সৃষ্টি করে। অতএব তারাও অগ্নিপূজকদের মতই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের পাশাপাশি দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ তারা বলে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি আর মানুষের কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি নয়। বরং মানুষই মানুষের কর্মের স্রষ্টা। এই দিক থেকে তারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক। সুতরাং তাক্বদীরে বিশ্বাস না করা শির্ক। তাক্বদীরের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমানের মাধ্যমেই তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়।

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন বান্দা জানে যে, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাধীন এবং আল্লাহর হুকুম দ্বারা পরিচালিত। সৃষ্টির নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। সে অন্যের উপকার কিংবা ক্ষতি করা তো দূরের কথা, নিজেই কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না। সে আরো জানে যে, সবকিছু আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন আর যাকে ইচ্ছা দান করেন না। তাঁর ফায়ছালা প্রতিরোধ করার কেউ নেই এবং তাঁর হুকুমকে কেউ পিছনে ফেলতে পারে না। বান্দার এই বিশ্বাস এককভাবে আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে না, কল্যাণ অর্জনের জন্য কিংবা অকল্যাণ প্রতিহত করার জন্য কবরের মাটি স্পর্শ করে না অথবা ওলী-আওলীয়া ও সৎলোকদের মাজারের আশ্রয় গ্রহণ করে না।

(৩) অন্তরের হিদায়াত ও ঈমান বৃদ্ধিঃ তাক্বদীরের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান পোষণকারীর তাওহীদ বাস্তবায়িত হয় এবং তাঁর ঈমান বাড়ে ও সে তার রবের হিদায়াতের উপরেই চলে। সুতরাং তাক্বদীরের প্রতি বান্দার ঈমানই হিদায়াত পাওয়ার উপায়। আল্লাহ্ তা'আলার বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾

"যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়"। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো মুছীবতই আপতিত হয় না। আর যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। (সূরা আত তাগাবুন ৬৪: ১১)

ইমাম আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে এমন মুমিন বান্দার কথা বলা হয়েছে, যে মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বাস করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং সন্তুষ্ট থাকে।[৬]

(৪) **ইখলাছ-একনিষ্ঠতা:** তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মুমিনকে ইখলাছের পথ দেখায় এবং তার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের প্রেরণা দেয়। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন বান্দা ভালোভাবেই জানে যে, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। সবকিছুর মালিকানা আল্লাহরই, তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়, যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। তিনি যদি কাউকে কল্যাণ দান করেন, কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না। তার হুকুমকে কেউ পিছনে ঠেলে দিতে পারে না। আর এটা তাকে একনিষ্ঠভাবে ইখলাছের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য তাকে আমল করতে উৎসাহিত করে এবং তার যাবতীয় আমলকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও কদর্যতা থেকে মুক্ত রাখে। মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করলে, অথবা তাদের প্রশংসা সংগ্রহের জন্য কিংবা তাদের নিন্দা থেকে বাঁচার জন্য বা তাদের থেকে ধন-সম্পদ, সেবা ও ভালোবাসা অর্জনের জন্য আমল করলে ইখলাছ নষ্ট হয়ে যায় অথবা ইখলাছের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়।

বান্দা যখন দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে যে, এই উপরোক্ত বিষয়গুলো আল্লাহর নির্ধারণ ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয় এবং আরো বিশ্বাস করবে যে, এ বিষয়গুলোতে মানুষের কোনো হাত নেই, সে কখনো মানুষ পরোয়া করবে না। আল্লাহকে নাখোশ করে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের কোনো চেষ্টা করবে না। সে মানুষের সন্তুষ্টির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দিবে এবং শির্ক ও রিয়ার উপর ইখলাছকেই প্রাধান্য দিবে। বান্দা যখন ইখলাছকে প্রাধান্য দিবে এবং রিয়া ও শির্ক থেকে দূরে থাকতে পারবে, তখনই কেবল সে ইখলাছের ফযীলত অর্জন করতে পারবে। এটা কতই না বড় ফযীলত। যে ব্যক্তি এটা অর্জন করতে পেরেছে সে কতই না সৌভাগ্যবান! কেননা ইখলাছই আমলের মর্যাদা বাড়ায়। এটাই মানুষের সাফল্যের সোপান। এই ইখলাছই মানুষকে আমলের পথে অটল রাখে, এটাই মানুষকে আমলের উপর শক্তিশালী করে এবং অন্তরকে আমলের উপর বেঁধে রাখে। এমনকি সে সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে যায়।

(৫) **তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) অর্জন:** আল্লাহর উপর ভরসা করাই হচ্ছে ইবাদতের মূল। তাক্বদীরের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান ব্যতীত কারো

---

[৬] দেখুন: যাদুল মাসীর, ইমাম ইবনুল জাওযী, (৮/২৮৩)

তাওয়াক্কুল সঠিক হয় না। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের শাইখ ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, দার্শনিকদের তাওয়াক্কুল সঠিক নয়; বরং তাদের এটা নেই বললেই চলে। সেই সঙ্গে তাক্বদীর অস্বীকারকারী কাদারীয়া সম্প্রদায়েরও তাওয়াক্কুল নেই। তারা বলে আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে এমন কিছু হয়, যা আল্লাহ তা'আলা চান না। তাই তারা ভালো কিছু অর্জন করতে গিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা না করে নিজের নফসের উপরই ভরসা করে। আর যেসব জাহমীয়া আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করে তাদের তাওয়াক্কুলও বিশুদ্ধ নয়। যারা আল্লাহর সমস্ত ছিফাত সাব্যস্ত করে, তাদের তাওয়াক্কুলই সঠিক হয়। শরী'আতের পরিভাষায় যেই তাওয়াক্কুলের কথা এসেছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমল করার সময় হৃদয়টাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে রাখা এবং অন্তর দিয়ে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া ও একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করা। এটাই হলো তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ। ইসলামী শরী'আত আমলকারীর অন্তরকে সবসময় তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর প্রতি নিজেকে সোপর্দ করার প্রদীপ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করে রাখার আদেশ দিয়েছে।

ইসলামী শরী'আত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছে। এটা অর্জন করার মাধ্যমেই তাওয়াক্কুল বাস্তবায়িত হয়। যে ব্যক্তি উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর ভরসা করে বসে থাকবে, তার তাওয়াক্কুল সঠিক নয়।

বান্দা যখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে, নিজেকে তাঁর নিকট সোপর্দ করবে এবং তার সকল কাজ-কর্ম আল্লাহর কাছে সমর্পন করবে, তখনই আল্লাহ তাঁকে শক্তি, দৃঢ়তা ও ধৈর্য দিয়ে সাহায্য করবেন এবং বান্দাকে তার নিজের জন্য বিপদাপদ ডেকে আনার প্রবণতা থেকে বাঁচাবেন ও তাকে এমন জিনিস বাছাই করার পথ দেখাবেন, তার জন্য উত্তম ফলাফল বয়ে আনবে। আর এটা আল্লাহ তা'আলা তখনই তাকে দেখাবেন যখন সে তার নিজের নফসের উপর নির্ভর করেই কোনো কিছু বাঁছাই করতে যাবে না।

এটাই বান্দাকে তার নিজের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির জিনিস বাছাই করার ক্লান্তিকর চিন্তা-ভাবনা থেকে শান্তি দেয় এবং তার অন্তরকে বিভিন্ন জিনিস বাছাই করার ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখে।

(৬) তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন: আপনি দেখবেন যে, তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন বান্দা সবসময় আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। সে সদাসর্বদা শেষ পরিণাম মন্দ হওয়া থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে। সে নিশ্চিত জানে না যে, তার সাথে কেমন আচরণ করা হবে এবং সে আল্লাহর

পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। এ জন্যই সে নিজের আমলকে সামান্য মনে করে এবং নিজের আমল যতই বড় হোক, তা নিয়ে প্ররোচিত হয় না। কারণ, আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে বান্দার অন্তর। তিনি যেভাবে ইচ্ছা বান্দার অন্তরগুলো ঘুরান-ফিরান। কার পরিণাম শুভ হবে, তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিত তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন তা মাংস পিন্ডে রূপান্তিরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন। এসময় তাকে চারটি বিষয় লিখার নির্দেশ দেয়া হয়: (১) সে কী পরিমাণ রিযিক পাবে। (২) বয়স কত হবে। (৩) কর্ম কী হবে এবং (৪) সে সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য হবে।

সেই সত্তার শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ নেই! তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় তাক্বদীরের লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের মতো আমল করে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করে। এমনিভাবে তোমাদের একজন জাহান্নামে যাওয়ার আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় তাক্বদীরের লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জান্নাতবাসীদের মতো আমল করে, পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করে"।[৭]

তিনি আরো বলেন, বান্দা জাহান্নামীদের আমল করে অথচ সে জান্নাতী। অপর পক্ষে বান্দা জান্নাতীদের আমল করে অথচ সে জাহান্নামী। বান্দার সর্বশেষ আমলই চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী।[৮]

(৭) **আল্লাহর কাছে দৃঢ় আশা ও তাঁর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ:** তাক্বদীরে বিশ্বাসী বান্দা সবসময় আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রাখে। আল্লাহর কাছে সে ভালো ও সুদৃঢ় আশা রাখে। কেননা সে জানে যে, আল্লাহ যেই ফায়ছালা করেন, তাতে রয়েছে পরিপূর্ণ ন্যায়-ইনসাফ, রহমত ও হিকমত। অতএব, তাক্বদীরের যেই ফায়ছালার কারণে বান্দা কষ্ট পায়, সেই জন্য সে

[৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৪৩।
[৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১২।

তার প্রভুকে দোষারোপ করে না। তার মনিব তার জন্য যা নির্বাচন করে তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে। অনুরূপ সে বিপদে পড়লে এই অপেক্ষায় থাকে যে, তার মনিব অচিরেই তার বিপদ দূর করবেন। এতে বিপদের সময় তার কষ্ট লাঘব হয়। বিশেষ করে যখন আল্লাহর প্রতি তার আশা প্রবল থাকে এবং উদ্ধারের ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তখন বিপদাপদের মধ্যে ডুবে থেকেও বান্দা পরিত্রাণের সুঘ্রাণ পায় এবং মুছীবতেও শান্তি ও স্বস্তি পায়।

(৮) ছ্বর বা ধৈর্যঃ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মুমিন বান্দাকে কষ্টদায়ক বিষয়ে সবরের উবুদিয়াতে অভ্যস্ত করে। ছ্বর করা উত্তম স্বভাব ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর রয়েছে বিরাট উপকারিত। রয়েছে শুভ পরিণাম ও উত্তম প্রভাব। অপছন্দনীয় কোনো কোনো বিষয়ে প্রত্যেক মানুষেরই ছ্বর করা আবশ্যক। হয় তাকে স্বেচ্ছায় ছ্বর করতে হবে আর না হয় বাধ্য হয়ে ছ্বর করতে হবে। তাক্বদীরের প্রতি ঈমানদার বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ছ্বর করে। কেননা সে সবরের শুভ পরিণাম সম্পর্কে অবগত থাকে। সে জানে যে, ছ্বর করলে বান্দা প্রশংসিত হয় এবং অধৈর্য হলে বান্দা নিন্দিত হয়। সে আরো জানে যে, ছ্বর না করে অস্থির-অধৈর্য হলে ছুটে যাওয়া জিনিস ফিরে পাওয়া যাবে না এবং অপছন্দনীয় জিনিসও তার কাছ থাকে অপসারিত হবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি বুদ্ধিমানের ন্যায় ছ্বর করবে না, সে আহমক ও পশুর মত ছ্বর করতে বাধ্য হবে। বুদ্ধিমান মুছীবতের প্রথম পর্যায়েই ছ্বর করে। এতে সে ছাওয়াব পায়। আর নির্বোধ ও দুর্বল ঈমানদার প্রথমে অধৈর্য ও অস্থির হয়। এতে তার কোনো লাভ হয় না। শেষ পর্যায়ে সে বাচ্চা হারা পশুর ন্যায় প্রথমে ছুটাছুটি করে। অতঃপর ছ্বর করতে বাধ্য হয়। এই ছ্বর মূল্যহীন।

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সবরের মধ্যেই আমরা উত্তম জীবন লাভ করেছি। আমীরুল মুমিনীন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ছ্বর এমন একটি বাহন, যা কখনো হোঁচট খায় না।[৯]

হাসান বাছরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ছ্বর হচ্ছে কল্যাণের গুপ্তধন। আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী মুমিন বান্দা ব্যতীত অন্য কাউকে এটা প্রদান করেন না। কবি বলেন,

الصبر مثل اسمه مرٌّ مذاقته *** لكن عواقبه أحلى من العسل

সবরের স্বাদ আস্বাদন করা তিক্ততর, কিন্তু এর পরিণাম মধুর চেয়েও মিষ্টি।

---

[৯] দেখুন: উদ্দাতুস সাবেরীন, পৃষ্ঠা নং ১২৪।

এই জন্যই আপনি দেখবেন যে, তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী শক্তিশালী মুমিন খুব ধৈর্যশীল। সে ভালো কাজে কষ্ট সহ্য করে এবং তাক্বদীরের তিক্ত বিষয় গুলোতে ধৈর্যধারণ করে। তাক্বদীরের প্রতি যার বিশ্বাস দুর্বল, সে এর বিপরীত। সে কষ্ট বরদাশত করতে পারে না, সামান্য দুঃখ-কষ্টেও ছ্বর করতে পারে না। বরং সে তাক্বদীরের কষ্টদায়ক বিষয়গুলোতে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপত্তি করে। ঈমানী দুর্বলতার কারণেই সে এমনটি করে থাকে।

যারা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তারা তুচ্ছ কারণেই অস্থির হয়ে যায়। কখনো কখনো এই অস্থিরতা তাদের পাগল বানিয়ে ফেলে। এমনকি নেশাদার দ্রব্যও গ্রহণ করে এবং কেউ কেউ মুছীবত সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

এই জন্যই যেসব দেশের লোকেরা তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না, সেসব দেশে বেশি বেশি আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। যেমন আমেরিকা, সুইডেন, নরওয়ে ইত্যাদি। শুনা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু দেশ আত্মহত্যা ঠেকাতে বিশেষ হাসপাতাল তৈরি করেছে।

আমরা যদি তাদের আত্মহত্যার কারণ খুঁজতে যাই তাহলে দেখা যাবে এর কারণ খুব তুচ্ছ। এতে দৃষ্টি এড়িয়ে নিলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু কেউ কেউ তা না করে আত্মহত্যা করে। কেউ কেউ আত্মহত্যা করে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে, কেউ পরীক্ষায় ফেল করার কারণে, কেউ করে তার প্রিয় গায়ক-গায়িকা ও নায়ক-নায়িকার মৃত্যু বরণ করার কারণে। প্রিয় খেলোয়ার ও প্রিয় ক্রীড়া দল পরাজিত হওয়ার কারণেও আত্মহত্যার খবর শুনা যায়।

ক্ষেত্রে বিশেষে গণহারে আত্মহত্যার কথাও শুনা যায়। অবাক হওয়ার বিষয় হলো, এসব আত্মহত্যাকারীর অধিকাংশই ধনবান, সম্পদশালী। এমন অভাবী-দরিদ্র নয় যে, তারা দারিদ্রের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে। ভোগবিলাসে ডুবে থাকার পরও তারা তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যা করে। অনেক সুনাম ধন্য ব্যক্তি, এমনকি মানসিক রোগ নিরাময়কারী ডাক্তাররাও আত্মহত্যা করে। অথচ তাদের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, তারা মানুষের জন্য সৌভাগ্য আনয়ন করবে এবং তাদের সমস্যার সমাধান দিবে। আসলে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান না থাকা অথবা দুর্বল অবস্থায় থাকার কারণেই এই বিড়ম্বনা হয়ে থাকে।

(৯) নৈরাশ্য ও হতাশার অবসানঃ যে মানুষ তাক্বদীরে বিশ্বাসী নয় অথবা এতে বিশ্বাস যার দুর্বল সে হতাশাগ্রস্ত হয়। নৈরাশ্য অতি সহজেই তার মধ্যে স্থান পায়। কোনো মুছীবতে পতিত হলে সে মনে করে এটা তার কোমর

ভেঙ্গে দিবে। কোনো দুর্ঘটনার কবলে পড়লে সে মনে করে এটা এমন আঘাত, যা কখনো নিঃশেষ হবে না।

যে মুমিন তাক্বদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে না, সে হকপন্থী ও বাতিল পন্থীদের বিরোধ ও সংঘর্ষের সময় হকপন্থীদেরকে সাময়িক দুর্বল ও পরাজিত দেখলেই মনে করে বাতিল সবসময় বিজয়ী থাকবে এবং হকপন্থীরা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া একটি প্রাণনাশক বিষ ও অন্ধকার কারাগার স্বরূপ।

অপরপক্ষে তাক্বদীরে বিশ্বাসী মুমিন হতাশা ও নৈরাশ্যকে পাত্তা দেয় না। আপনি তাকে সবসময় আশাবাদী দেখবেন। সে সর্বদা তার প্রভুর পক্ষ হতে বিপদাপদ মুক্ত হওয়ার আশা রাখে। সে ভালো করেই জানে কষ্টের পরেই রয়েছে বিজয় এবং দুঃখের পরেই রয়েছে সুখ। সে দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, তাকওয়া ও তাকওয়াবানদের পরিণামই শুভ হয়। বিপদাপদের সময় সে বিশ্বাস করে যে, তাক্বদীরে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এতে হতাশা ও নৈরাশ্য তার কাছে স্থান পায় না। হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় সে অন্তর দিয়ে আল্লাহর মহান কুদরত ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী থাকে, তাঁর দয়া-রহমতের আশা রাখে। এই বিশ্বাস ও আশা তার অন্তর থেকে নৈরাশ্য ও হতাশার জীবাণুর মূলোৎপাটন করে ফেলে।

(১০) আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি: তাক্বদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দার অবস্থা সবসময় উন্নত থাকে। সে সর্বদা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী বান্দা ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এর ফলাফল স্বরূপ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে হতভাগ্য হয়।

এই জন্যই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর প্রশস্ত দরজায় অবস্থান করার নামান্তর। এটাই দুনিয়ার জান্নাত, ইবাদতকারীদের আশ্রয়স্থল এবং আল্লাহর রহমতকামীদের চোখের শীতলতা।[১০]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টি দিয়ে যে ব্যক্তি তার হৃদয় ভরপুর রাখবে, আল্লাহ তার অন্তরকে অভাবহীনতা, নিরাপত্তা ও পরিতৃপ্তি দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন এবং তাঁর অন্তরকে আল্লাহর ভালোবাসার জন্য উন্মুক্ত করে রাখবেন। তাকে নিজের দিকে টেনে নিবেন এবং তাঁর উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসাকারী বানাবেন।

---

[১০] দেখুন: মাদারিকুস সালেকীন, (২/১৭২)।

যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি থাকবে না, তার অন্তর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টিতে ভরে যাবে। সে তাঁর নিজের সৌভাগ্য ও সাফল্যের পরিবর্তে দুর্ভাগ্যকেই ডেকে আনবে।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রহিমাহুল্লাহ) কে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো, বান্দা কখন তাক্বদীরের তিক্ততর জিনিসের সন্তুষ্ট থাকার ফযীলত অর্জন করতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, বান্দা যখন নিজের নফসকে চারটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং স্বীয় অন্তর ও জবান দিয়ে তা বলতে পারে।

(১) সে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে দান করো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করবো।

(২) তুমি যদি আমাকে না দাও, তাহলে আমি সন্তুষ্ট থাকবো।

(৩) তুমি যদি আমাকে বর্জন করো, তাহলে আমি তোমার ইবাদতে নিমগ্ন থাকবো।

(৪) আর তুমি যদি আমাকে আহব্বান করো, তাহলে আমি তোমার আহব্বানে সাড়া দিবো।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, ব্যথা অনুভব না করা তাক্বদীরের কষ্টদায়ক জিনিসগুলোতে সন্তুষ্ট থাকার ফযীলত অর্জন করার শর্ত নয়। বরং ব্যথা তো অনুভব করবেই; তবে শর্ত হচ্ছে তাক্বদীরের উপর আপত্তি ও বিরক্তি প্রকাশ করবে না।

কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, আল্লাহ তোমার সাথে যেসব আচরণ করেন, তুমি তার সবগুলোতেই সন্তুষ্ট থাকো। কেননা আল্লাহ তোমাকে কিছু দান করা থেকে বিরত থাকলে তুমি বিশ্বাস করবে যে, তোমাকে দেয়ার জন্যই বিরত রয়েছেন, তোমাকে উদ্ধার করার জন্যই বিপদগ্রস্ত করেছেন, সুস্থ করার জন্যই অসুস্থ করেছেন এবং তোমাকে পরিপূর্ণ হায়াত দান করার জন্যই তোমার মৃত্যু ঘটাবেন। অতএব এক মুহূর্তের জন্যও তোমার রবের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। তাহলে তুমি তাঁর দৃষ্টি থেকে ছিটকে পড়বে।[১১]

তাক্বদীরের লিখন থেকে পালাবার কোনো সুযোগ নেই। বান্দা যদি আল্লাহর ফায়ছালা ও নির্ধারণে সন্তুষ্ট থাকার পরও তাক্বদীরের তিক্তকর বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তাহলে সে প্রশংসিত হয় এবং সে আল্লাহর দয়া পেয়ে ধন্য। আর যদি তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী ও সন্তুষ্ট না হয়, তাহলেও তার

---

[১১] উপরোক্ত তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।

উপর তাক্বদীরের তিক্ত বিষয় চেপে বসে। অতঃপর সে নিন্দিত হয় এবং আল্লাহর রহমত ও দয়া থেকে মাহরুম হয়।

(১১) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা: তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন বান্দা বিশ্বাস করে যে, সে যেই নিয়ামতের মধ্যে রয়েছে তা কেবল আল্লাহর পক্ষ হতেই। সে জানে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অপ্রিয় ও কষ্টকর জিনিস প্রতিহত করেন। এই বিশ্বাস তাকে একমাত্র আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে উৎসাহিত করে। প্রিয় বস্তু অর্জন করতে পারলে সে এই জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত নিয়ামত ও কল্যাণ দানকারী।

আর সে যখন কষ্টকর বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখন সে আল্লাহর নির্ধারিত ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহর সাথে আদব রক্ষার্থে ক্রোধ নিবারণ করে, অভিযোগ-আপত্তি গোপন রাখে ও আল্লাহর মারিফত হাসিলের পথ অবলম্বন করে। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে তার ইলম ও আল্লাহর সাথে তার আদব তাকে প্রিয়-অপ্রিয় উভয় জিনের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ দেয়। যদিও কষ্টকর বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তার জন্য কঠিনতর হয়ে থাকে। এই জন্যই অপ্রিয় জিনিসের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার চেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মর্যাদা অনেক বেশি।

মানুষ যখন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে তখন তার নিয়ামত স্থায়ী হয়। অতএব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে অর্জিত নিয়ামতকে আটকানো যায় এবং ছুটে যাওয়া নিয়ামতকে পুনরুদ্ধার করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিবো"। (সূরা ইবরাহীম: ৭) অতএব যখন আপনি দেখবেন আপনার নিয়ামত বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তখন আপনি দ্রুত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

(১২) আনন্দিত হওয়া: তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন বান্দা তার এই বিশ্বাস নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"তুমি বলে দাও, এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁরই করুণায়। সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা অর্জন করে এটা তার চেয়ে অধিক উত্তম"। (সূরা ইউনূস: ৫৮)

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন বান্দা যখন আল্লাহর ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহর নির্ধারণের প্রতি শুকরিয়া আদায় করে, তখন তার এই অবস্থার উন্নতি হয়ে খুশি ও আনন্দিত হওয়ার স্তরে উন্নীত হয়। ফলে সে আল্লাহর প্রত্যেক নির্ধারণ ও ফায়ছালায় খুশি ও আনন্দিত হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অন্তরের আনন্দ অন্তরের সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আর অন্তরের বিষণ্নতা ও দুঃখ-কষ্ট অন্তরের জন্য সবচেয়ে কঠিন শাস্তি। কোনো জিনিস নিয়ে আনন্দিত হওয়া তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার চেয়ে ভালো। কেননা সন্তুষ্ট থাকাতে স্বস্তি ও স্থিরতা অর্জিত হয়। কিন্তু খুশি ও আনন্দিত হওয়াতে মজা ও স্বাদ পাওয়া যায়। অতএব প্রত্যেক আনন্দিত ব্যক্তি সন্তুষ্ট; কিন্তু প্রত্যেক সন্তুষ্ট ব্যক্তি আনন্দিত নয়।

(১৩) বিনয়ী হওয়াঃ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মানুষকে বিনয়ী বানায়। তার ধন-সম্পদ, সম্মান, ইলম, সুখ্যাতি ইত্যাদি যত বেশিই হোক না কেন। কেননা সে বিশ্বাস করে যে, এসব থেকে তাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ অনুযায়ীই দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে এসব কিছু ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। এ কারণেই সে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় এবং মানুষের জন্যও বিনয়ী হয়। নিজের নফসকে অহংকার থেকে বিরত রাখে। মানুষ যখন বিনয়ী হয়, তখন তার নেতৃত্ব পরিপূর্ণ হয়, তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি সম্মানবোধ বেড়ে যায়। ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উপরে উঠান। আর আল্লাহ যাকে উপরে উঠান, তাকে নিচে নামানোর কেউ নেই।

(১৪) দানবীর হওয়াঃ তাক্বদীরের প্রতি ঈমানদার বান্দা অবশ্যই জানে যে, আল্লাহই একমাত্র রিযিক দাতা। আল্লাহই মানুষের মধ্যে রিযিক বন্টন করেন। প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে নির্ধারিত রিযিক। রিযিক ও বয়স শেষ হওয়ার আগে কেউ মৃত্যু বরণ করবে না। আল্লাহর নির্ধারণ ব্যতীত কেউই ফকীর হবে না।

এই বিশ্বাস কল্যাণকর খাতে মানুষকে খরচ করতে উৎসাহিত করে। তাই সে প্রয়োজন থাকলেও মালের একটা অংশ খরচ করাকেই প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর উপর আস্থা ও তাঁর খরচ করার প্রতি তাঁর আদেশকে প্রাধান্য দিয়ে সে এটা করে থাকে। সে জানে যে, এই ধন-সম্পদ আল্লাহর। অতএব, আল্লাহ এটাকে যেখানে খরচ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানেই খরচ করতে হবে।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মানুষের অন্তরকে লোভ-লালসা থেকে পবিত্র করে। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী বান্দা দুনিয়ার কুকুরে পরিণত হয় না। সে কেবল তার প্রয়োজন অনুপাতেই দুনিয়ার সম্পদ কামাই করে। তাই দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে সে কপালের ঘাম পায়ে ফেলে না এবং মানুষের হাতে যে সম্পদ আছে তার প্রতি কোনো লোভ-লালসাও করে না।

(১৫) সাহসিকতা ও নির্ভীকতা অর্জন: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মানুষের অন্তরকে সাহসিকতা ও নির্ভীকতায় ভরে দেয় এবং প্রত্যেক ভয়-ভীতি থেকে তার অন্তরকে মুক্ত করে। কেননা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন জানে যে, সে নির্ধারিত দিনের আগে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আল্লাহ তার ভাগ্যে যা লিখেছেন, তার চেয়ে বেশি সে পাবে না এবং সারা দুনিয়ার মানুষ তার বিরুদ্ধে একত্রিত হলেও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতি ছাড়া তারা আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কাপুরুষেরা মনে করে জিহাদে অংশগ্রহণ করলে হায়াত শেষ হওয়ার আগেই মারা যাবে। অথচ যুদ্ধ হতে পলায়নকারী কাপুরুষ বীর মুজাহিদের আগেই মারা যায় আর জিহাদে অংশ গ্রহণ করে সাহসী বীরপুরুষ তা থেকে ফিরে আসে, সগৌরবে বেঁচে থাকে ও দীর্ঘজীবি হয়। মৃত্যু শর্য্যায় উপনীত হয়ে আল্লাহর তরবারী খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি প্রায় একশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এসব যুদ্ধে শত্রুরা আমাকে হত্যা করার বহু চেষ্টা করেছে। আমার শরীরে এমন কোনো জায়গা খালি নেই, যেখানে তীর, তলোয়ার কিংবা বর্শার আঘাত পাওয়া যাবে না। এই তো আমি আজ নিজের বিছানায় শুয়ে মারা যাচ্ছি। শত্রুর মোকাবেলা করতে জিহাদে নামলেই যদি মৃত্যু হতো, তাহলে আমি বহু আগেই মারা যেতাম। অতএব ধ্বংস হোক জাতির কাপুরুষ সন্তানরা।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর নিকট নিজেকে সোপর্দ করার মাধ্যমেই মৃত্যু বা অন্যান্য বিষয়ের ভয়-ভীতি চলে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে সোপর্দ করে এবং তাঁর জন্য আত্মসমর্পন করে, তার অন্তরে মানুষকে ভয় করার মত কোনো জায়গা খালি থাকে না। কেননা যেই নফসের উপর তার আশঙ্কা ছিল, তা তো তার মালিক ও অভিভাবকের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। সে জানতে পেরেছে যে, নফসের মালিক নফসের জন্য যা কিছু লিখেছেন, তার বেশি হবে না। আর যা লিখা হয়েছে, তা অবশ্যই হবে। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করার কোনো কারণ নেই।

(১৬) অল্পে পরিতৃপ্ত থাকা: তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন বান্দা জানে যে, তার রিযিক বন্টিত ও নির্ধারিত। নির্ধারিত রিযিক শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে মরবে না। আসলে কোনো লোভীর লোভ রিযিক আনয়ন করে না এবং কোনো হিংসুকের হিংসা তা প্রতিরোধ করতে পারে না। মানুষ আপনার রিযিকের ব্যবস্থা করা কিংবা আপনার রিযিক ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন, তারা কেবল সেটুকুরই ব্যবস্থা করতে পারবে, যা আপনার জন্য লিখা হয়েছে।

আপনার মধ্যে যদি উপরিউক্ত বিশ্বাস থাকে, তাহলে আপনি যা অর্জন করতে পেরেছেন, তা নিয়ে পরিতৃপ্ত হবেন। আমি এ কথা বলছি না যে, আপনি আপনার নিজের অবস্থার উন্নয়ন করার চেষ্টা করবেন না; বরং অবশ্যই তা করবেন। পরিতৃপ্ত থাকার অর্থ হচ্ছে রিযিক ও দুনিয়ার অন্যান্য বিষয়ে নিজের অবস্থার উন্নয়ন করার চেষ্টা করা। আমার কথার অর্থ হচ্ছে, চেষ্টার পর যা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকা এবং অতিরিক্ত লোভ ও দুনিয়ার অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের জন্য অস্থির হয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকা। যখন কোনো মানুষকে অর্জিত রিযিক নিয়ে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হওয়ার নিয়ামত দেয়া হয়, তখন তার ভাগ্যকপালে সৌভাগ্যের সূর্যের আলো সদা আলোকিত থাকে।

আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তার জীবন অস্থির হয়ে যায়, তাঁর ব্যথা, বেদনা ও দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি পায়। তার নফসের মধ্যে অল্পে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকার গুণাবলী অনুপস্থিত থাকার কারণে এবং অন্যায় লোভ-লালসায় তার অন্তর ভরপুর থাকার কারণেই এমনটা হয়ে থাকে।

ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

رَأَيتُ القَناعَةَ رَأسُ الغِنى + فَصِرتُ بِأَذيالِها مُتَمَسِّكِ

فَلا ذا يَرانِي عَلى بابِهِ + وَلا ذا يَرانِي بِهِ مُنهَمِكِ

فَصِرتُ غَنيّاً بِلا دِرهَمٍ + أَمُرُّ عَلى الناسِ شِبهَ المَلِكِ

আমি দেখেছি যে, অল্পে সন্তুষ্ট থাকাই সর্বোচ্চ ধনাঢ্যতা। তাই আমি অল্পে সন্তুষ্ট থাকার স্বভাবকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছি।

তাই আমাকে কেউ তার দরজায় দেখে না। দেখে না কেউ আমাকে তার আশ-পাশে ঘুরঘুর করতে।

আমি এক দিরহামের মালিক না হয়েও ধনী। মানব সমাজে চলাচল করি রাজকীয় বেশে।

(১৭) উচ্চাকাঙ্খা পোষণঃ তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস মুমিন বান্দাকে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ ও মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উঁচু সংকল্প করার উৎসাহ দেয় এবং তাকে দীন-দুনিয়ার অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য কাজ করার প্রতি ধাবিত করে। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মুমিন ব্যক্তিকে তাক্বদীরের তিক্ততর বিষয়ের সামনে আত্মসমর্পন করতে নিরুৎসাহিত করে। এ কারণেই আপনি দেখবেন যে, তাক্বদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দা তার হৃদয়ে উঁচু আকাঙ্খা বাস্তবায়নের সুদৃঢ় সংকল্প বহন করে, সে হয় বড় মনের অধিকারী, কল্যাণকর ও মহৎ বিষয়ে পূর্ণতাকামী এবং তুচ্ছ ও অনর্থক বিষয় থেকে সে নিজেকে রাখে বহু দূরে। সে নিজের জন্য কখনো হীনতা পছন্দ করে না, বেদনাদায়ক তিক্ততর অবস্থা নিয়ে বসে থাকে না; বরং সে তার বেদনাদায়ক ও তিক্ততর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে প্রাণপন চেষ্টা করে এবং তাক্বদীরের দলীল পেশ করে অন্যায় ও দোষত্রুটিতে লিপ্ত হয় না।

বরং তাক্বদীরের প্রতি তার বিশ্বাস তাকে চেষ্টা চালানোর আহবান জানায় এবং বৈধ পন্থায় তার বেদনাদায়ক তিক্ততর বাস্তবতাকে উত্তম অবস্থার দ্বারা পরিবর্তন করতে উৎসাহ দেয়। তাকে দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি পরিহার করার আহ্বান জানায়। আর এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বিপদাপদে নিপতিত হয়েই কেবল তাক্বদীর দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে; ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত থাকা অবস্থায় নয়।

(১৮) সমস্ত কাজে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়াঃ তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন বান্দা তার সমস্ত কাজে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়। সমস্ত সুযোগ সে কাজে লাগায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য হয় প্রবল আগ্রহী। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান তাকে এদিকেই আহব্বান জানায়; কর্মহীন হয়ে কিংবা সামান্য কাজ নিয়ে বসে থাকার জন্য নয়।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মুসলিম জাতির মহৎ ব্যক্তিদেরকে অতীতে এমন বিশাল বিশাল কাজের প্রতি ধাবিত করেছে, যা আমাদেরকে অবাক করে দেয়। অথচ এত বিশাল কাজের উপকরণ তাদের কাছে খুব কমই বিদ্যমান ছিল। তাদের কৃতিত্বের উপর তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের ছিল বিশেষ প্রভাব। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি এমন কাজে আগ্রহী হও, যা তোমার উপকার করবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। অপারগ হয়ো না। তোমার কোনো বিপদ হলে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম! বরং বলো এটাই আল্লাহর নির্ধারণ। তিনি যা চেয়েছেন করেছেন। কেননা যদি শব্দটি শয়তানের দুয়ার খুলে দেয়।[১২]

(১৯) সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থায় ভারসাম্য ঠিক থাকা: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মানুষের সর্বাবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে। কারণ, পার্থিব জীবনে মানুষ বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। কখনো কখনো তাকে দারিদ্রতায় ফেলে পরীক্ষা করা হয়। কখনো কখনো দুনিয়ার সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে সৌভাগ্যবান হয়। কখনো আবার অসুস্থ হয়। কখনো আবার পদমর্যাদা ও সুখ্যাতি অর্জন করে। কখনো পদমর্যাদা ছুটে যায়, অপদস্থ হয় এবং তার সুনাম-সুখ্যাতি কমে যায়।

এসব বিষয় মানুষের মনের মধ্যে প্রভাব ফেলে। দারিদ্র মানুষকে অন্যের কাছে নত ও বশীভূত করে। আর ধনাঢ্যতা নিকৃষ্ট মানুষের চরিত্রকে আরো নষ্ট করে এবং তাকে অহংকারী বানায়। তার আচার-আচরণ ও চালচলন মন্দ হয়।

অসুস্থতা ও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় কোনো কোনো মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যায়। তার চরিত্রের ভারসাম্য ঠিক থাকে না। কোনো কোনো মানুষ অস্থির ও অধৈর্য হয়। অনুরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়ে মানুষের চারিত্রিক পরিবর্তন হয়।

মোটকথা মানুষের অবস্থা এক রকম থাকে না। তাদের মধ্যে ত্রুটি, অজ্ঞতা, দুর্বলতা ইত্যাদি থাকার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষেই তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী তার অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। ধন-সম্পদ তাকে অহংকারী বানায় না। বিপদাপদ তাকে নিরাশ ও হতাশ করে না। রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা তাকে অহংকারী বানায় না। বরখাস্ত হলেও সে

[১২] ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪।

উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন হয় না। যেমন দারিদ্র তাকে অন্যের কাছে নত ও বশীভূত করে না।

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিনগণ আনন্দ দায় ও প্রিয় বস্তু পেয়ে খুশি মনে গ্রহণ করে। তাতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং এগুলোকে দীন ও দুনিয়ার কাজের সহায়ক বানায়। এর বিনিময়ে আরো বরকত ও কল্যাণ দেয়া হয়, যা তাদের আনন্দকে আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

অপর পক্ষে তারা অপছন্দীয় জিনিসের সম্মুখীন হলে ছাওয়াবের আশায় তাতে ছ্বর করে এবং সহজভাবে তা মেনে নেয়। আর এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে প্রতিরোধ করা সম্ভব, সেগুলোকে তারা প্রতিরোধ করে কিংবা এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর চেষ্টা করে। আর যেগুলো দূরিভূত করা সম্ভব নয়, তাতে তারা সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ করে। এর মাধ্যমে তারা বিরাট কল্যাণ অর্জন করে থাকে। এর ফলে তাদের কষ্টকর বিষয়গুলো দূর হয়ে যায় এবং তার স্থলে আরাম ও আনন্দ দায়ক বিষয়গুলো চলে আসে। উমাইয়্যা খলীফা উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি প্রত্যুষে ঘর থেকে বের হই। ঘর থেকে বের হয়েই আমার দরজার সামনে সুখ ও দুঃখ এ দু'টি বাহনকেই দাঁড়ানো দেখি। এ দু'টির যে কোনো একটিতে আরোহন করতে কোনো দ্বিধা-সংকোচ করি না।

(২০) হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিরাপত্তা লাভঃ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান অনেক সমাজ বিধ্বংসী ব্যাধি থেকে মানুষকে নিরাপত্তা ও মুক্তি দেয়। এটি হিংসা নামক নিকৃষ্ট ব্যাধি এবং অনুরূপ অন্যান্য অন্তরের রোগ থেকে মানুষকে বাঁচায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী মুমিন হিংসা করে না। কেননা সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলাই তাকে তাদেরকে সেটা দান করেছেন। তিনি তাদের রিযিক নির্ধারণ করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দিয়েছেন এবং যাকে ইচ্ছা দেননি। তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই এমনটি করেন। কোনো মানুষ যখন অন্যের নিয়ামতে হিংসা করে তখন সে আল্লাহর নির্ধারণে আপত্তি করে থাকে। আর বান্দা যখন তাক্বদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তখন হিংসা নামক নিকৃষ্ট রোগ থেকে বেঁচে যায় এবং আল্লাহর বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা থেকেও বেঁচে যায়। সে তার সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে।

(২১) সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর হিকমত সম্পর্কে জানাঃ তাক্বদীরের প্রতি সঠিক ঈমান মানুষের সামনে তাক্বদীরের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার হিকমত

উন্মোচিত করে। সে জানতে পারে যে, তার চিন্তা ও কল্পনার বাইরে এমন এক সত্তা রয়েছেন, সবচেয়ে মহান, সর্বাধিক অবগত ও সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ।

এই জন্যই আমরা অনেক সময় এমন ঘটনার সম্মুখীন হই, যা আমাদের জন্য অপছন্দনীয়। অথচ সেটাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। কখনো কখনো আমরা বাহ্যিকভাবে কোনো জিনিসকে আমাদের জন্য কল্যাণকর দেখতে পাই এবং তাকে আমরা ভালোবাসি ও তা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবি হয় ভিন্ন। মানুষের প্রকৃত ব্যবস্থাপক ও পরিচালক আল্লাহ তা'আলা জানেন কোথায় রয়েছে তার কল্যাণ এবং তিনি জানেন তার কাজ-কর্মের পরিণাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

"তোমরা এ ঘটনাকে অকল্যাণকর বলে মনে করো না, বরং এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।" (সূরা আন নূর ২৪:১১) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

"এবং তোমরা কখনও এমন বিষয়কে অপছন্দ করবে, যাতে আল্লাহ অপরিমিত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। সূরা আন নিসা ৪:১৯ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা এমন জিনিসকে পছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন। কিন্তু তোমরা জানো না। (সূরা আল বাকারা ২:২১৬)

এই আয়াতের উদ্দেশ্য ও হিকমত হচ্ছে, বান্দা সব কিছু সেই সত্তার নিকট সোপর্দ করে দিবে, যিনি সমস্ত কাজের পরিণাম সম্পর্কে অবগত। অতঃপর আল্লাহ তার জন্য যে বিষয়ের ফায়ছালা করবে, তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। এই আয়াতটি আমাদেরকে আরো শিক্ষা দেয় যে, আমরা আল্লাহর কাছে এমন বিষয় চাইবো না, যে সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। মানুষ কখনো এমন জিনিস আল্লাহর কাছে চায়, যা তার জন্য ক্ষতিকর। অথচ সে তা জানতে পারে না। অতএব আল্লাহ তার জন্য যেটাই নির্বাচন করেন, সে তার শুভ পরিণাম চাইবে। এর চেয়ে বেশি উপকারী তার জন্য আর কিছু নেই।

বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, বান্দা কখনো কখনো আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোনো একটি জিনিস চায়। সে মনে করে এটা তার আশা-আকাঙ্খা পূরণ করবে। অথচ আল্লাহ জানেন যে, এটা তার জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ তার মাঝে ও তার চাওয়ার মাঝে অন্তরায় হয়ে যান এবং তাকে সেটা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। বান্দা এতে মনক্ষুন্ন হয়। অথচ সে জানে না যে, আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়াশীল। তিনি তার জন্য উপকারী জিনিসটি রেখে দিয়েছেন এবং ক্ষতিকর জিনিসটি চাওয়া সত্ত্বেও তার থেকে সেটা সরিয়ে রেখেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অনেক মানুষ বিমান বন্দরে যায়। কিন্তু একটু দেরি হওয়ার কারণে তার বিমান তাকে রেখেই চলে যায়। এতে সে অনুতপ্ত হয় ও আফসোস করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শুনা যায় যে, সেই বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে এবং সকল যাত্রীই নিহত হয়েছে। অনেক মানুষ প্রিয় বস্তু ছুটে যাওয়ার কারণে কিংবা বিপদের সম্মুখীন হয়ে বিরক্ত হয় ও তার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর যখন সেটার পরিণাম ভালো হয় এবং তাক্বদীরের রহস্য ও গোপনীয়তা উন্মুক্ত হয়, তখন সে খুশি ও আনন্দিত হয়।

মিশরের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও আলেম আলী তানতাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ১৩৮২ হিজরীতে আমি সৌদি আরবে রিয়াদে বসবাস করছিলাম। আমাদের সাথে সিরিয়ার এক লোক বসবাস করতো। কোনো এক জরুরী কাজে তার লেবানন যাওয়ার প্রয়োজন পড়লো। কিন্তু তার মা এই সফরে বের হওয়া মোটেই পছন্দ করলো না। কারণ তার ছেলে লেবানন চলে গেলে তাকে বাড়িতে একাকী থাকতে হবে।

সফরের সময় ঘনিয়ে আসলে সে তার মাল-পত্র হাতে নিয়ে বিমান বন্দরে গেলো। কোম্পানীর লোকদেরকে তা বুঝিয়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসলো। কারণ পরের দিন প্রত্যুষে ছিল তার সফরের সময়। বাড়িতে ফিরে এসে এই ভেবে সে ঘুমিয়ে পড়লো যে, ফজর হওয়ার আগেই তার মা তাকে জাগিয়ে দিবে। কিন্তু তার মা তাকে জাগিয়ে দিলো না। অতঃপর বিমান উড্ডয়নের মাত্র বিশ-ত্রিশ মিনিট বাকি থাকতে সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দ্রুত গাড়িতে আরোহণ করলো। ড্রাইভারকে সে খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বিমান বন্দরে নিয়ে যেতে বললো এবং ড্রাইভারকে সে দ্বিগুণ ভাড়া দেয়ার ওয়াদা করলো।

সেই সঙ্গে সে আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দু'আ করতে থাকলো। যাতে তিনি বিমান উড্ডয়নের আগেই তাকে এয়্যারপোর্টে পৌঁছার তাওফীক দেন।

সে বিমান বন্দরে গিয়ে দেখলো বিমান উড়াল দেয়ার সময় এখনো বাকি আছে। তাই সে অপেক্ষাকারীদের সাথে চেয়ারে বসে পড়লো। এরই মধ্যে তার ঘুম চলে আসলে সে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানের যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বিমানে উঠার জন্য মাইকে ঘোষণা করা হলো। কিন্তু লোকটি সেই ঘোষণা শুনতে পেলো না। ঘুম থেকে উঠে দেখলো বিমান আকাশে উড়াল দিয়েছে। শাইখ আলী তানতাবী বলেন, আমি তার সাথেই ছিলাম। সে এতে অবাক হয়ে বলতে লাগলো, আমি নিরুপায় হয়ে একনিষ্ঠ হৃদয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কেন আমার দু'আয় সাড়া দিলেন না?

আমি তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম। তাকে বললাম, কোনো বান্দা যখন নিরুপায় হয়ে ইখলাছের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে, তিনি তার দু'আ কবুল করেন। তিনি বান্দার দু'আ কখনো ফেরত দেন না। মানুষ কখনো কখনো কল্যাণের জন্য দু'আ করতে গিয়ে অকল্যাণের দু'আও করে ফেলে। কোথায় তাদের কল্যাণ রয়েছে, এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আমার এই উপদেশবাণী বুঝতে না পেরে তার ক্রোধ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে গেলো। আপনারা কি জানেন এই ঘটনার পরিসমাপ্তি কীভাবে হয়েছিল? সেই দিন মিডিল ইস্ট কোম্পানীর যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল আপনাদের কেউ কেউ সম্ভবত সে সম্পর্কে জেনে থাকবেন। তাতে সকল যাত্রীই নিহত হয়েছিল। এই বিমানে আরোহণ করতে না পেরেই লোকটি বিষন্ন হয়েছিল।

মানুষ কখনো কখনো আল্লাহর কাছে এমন জিনিস চায়, যা তার জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে তা প্রদান করেন না। কারণ বান্দা তার নিজের প্রতি যতটা দয়াশীল আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি তার চেয়ে আরো বেশি দয়াশীল।

পিতা তার সন্তানকে বাজারে নিয়ে যায়। সন্তান খেলনা দেখে পিতাকে তা কিনে দিতে বলে। পিতা তাকে সেটা কিনে দেয়। ফলের দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মিষ্টি ফল দেখে তা কিনে দিতে বললে পিতা তা কিনে দেয়। চকলেট কিনে দেয় এবং এ জাতীয় আরো উপকারী জিনিস কিনে দেয়।

কিন্তু ঔষধের দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সবুজ রং এর সুন্দর প্যাকেটে ঔষধ পেচানো দেখে সন্তান পিতার কাছে তাও চায়। কিন্তু এই ঔষধ শিশুর জন্য ক্ষতিকর জেনেও কি পিতা তার সন্তানকে তাকে কিনে

দেয়? কখনো নয়। পিতা যেহেতু তার সন্তানের জন্য উপকারী জিনিসগুলো সম্পর্কে অবগত থাকে এবং তার জন্য ক্ষতিকর বস্তুগুলো সম্পর্কেও জানে তাই সে সন্তানের প্রত্যেক দাবি পূরণ করে না। কেননা সন্তান তার পিতার কাছে কখনো এমন জিনিস চায়, যা তার জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তার বান্দাদের প্রতি তাদের পিতা-মাতার চেয়েও অধিক দয়াশীল, তাই তিনি তার বান্দা যা চায় তাই প্রদান করেন না।

(২২) কুসংস্কার ও বাতিল থেকে বিবেক-বুদ্ধিকে মুক্ত করা: তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী বান্দা সহজেই বুঝতে পারে যে, সৃষ্টির মধ্যে যা ঘটছে এবং যা ঘটবে, তা কেবল আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ীই। আর যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন এবং এখনো যা ঘটেনি, তা লুকায়িত ও গোপন। ঘটার আগে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। কারণ, আল্লাহ তা কাউকে জানাননি।

তাই আপনি দেখবেন, তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী বান্দা প্রতারক, ভেলকিবাজ, গণক, জ্যোতিষী ও ভাগ্য গণনাকারীর নিকট যায় না এবং তাদের কথায় বিশ্বাস করে না। সে তাদের এসব মিথ্যা ও বাতিল কথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ থাকে।

(২৩) অন্তরের স্থিরতা, নফসের প্রশান্তি ও হৃদয়ের আনন্দ: এ বিষয়গুলো তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের ফলাফল। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী বান্দাই এগুলো অর্জন করে সৌভাগ্যবান হতে পারে। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসী বান্দার অন্তর থাকে স্থির, আত্মা থাকে প্রশান্ত এবং হৃদয় থাকে আনন্দিত। সম্ভাব্য অকল্যাণ নিয়ে সে বেশি চিন্তা-ভাবনা করে না। অতঃপর যদি অকল্যাণ এসেই যায়, তাতে তার হৃদয় উড়ে যায় না। বরং সে ছ্ববর ও দৃঢ়তার সাথে তা বরদাশত করে। সে অসুস্থ হলে দুশ্চিন্তায় পড়ে না ও রোগ আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তার অসুখ আরো বেড়ে যায় না। বিপদাপদ ও কষ্ট আসলে সে নির্ভীক চিত্তে তার মোকাবেলা করে। এতে তার কষ্টের তীব্রতা কমে যায়।

কথিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সৎলোকদের কোনো একজন লোকের ছিল মাথায় টাক, তার শরীরে ছিল কুষ্ঠ রোগ, দু'চোখই ছিল অন্ধ এবং উভয় হাত ও উভয় পা ছিল অবশ। তিনি সবসময় বলতেন,

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً ممن خلق، وفضلني عليهم تفضيلاً

"আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে অনেক মানুষের রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ রেখেছেন এবং আমাকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন"।

তার কাছ দিয়ে এক লোক যাওয়ার সময় তাকে বললো, আল্লাহ তোমাকে কী থেকে সুস্থ রেখেছেন? তুমি অন্ধ, কুষ্ঠরোগী এবং তোমার মাথায় টাক এবং উভয় হাত ও উভয় পা অচল। তোমার সুস্থতা কোথায়?

লোকটির কথা শুনে উক্ত সৎলোক বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! আল্লাহ আমাকে তাঁর যিকিরকারী জবান দিয়েছেন, কৃতজ্ঞ অন্তর দিয়েছেন এবং রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুছীবতে ছ্বর করার মতো শরীর দিয়েছেন। অতএব আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অতএব, বুদ্ধিমত্তার দাবি হচ্ছে, মানুষ এক সাথে দু'টি কষ্টকে একত্রিত করবে না। একটি মুছীবতে আক্রান্ত হওয়ার বাহ্যিক ও দৌহিক কষ্ট এবং অন্যটি অন্তরের অস্থিরতা, অশান্তি ও উদ্বিগ্নতার কষ্ট। তাক্বদীরের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ব্যতীত দ্বিতীয় কষ্টটি দূর করা অসম্ভব।

মানুষ তখনই সুখী হয়, যখন সে দুশ্চিন্তা ও তার কারণ থেকে দূরে থাকে। আপনি যখন মুসলিমদের বিজ্ঞ আলেম ও একনিষ্ঠ আবেদদের জীবনী পড়বেন, তখন তাদের মধ্যে আন্তরিক স্থিরতা ও নফসের প্রশান্তি খুঁজে পাবেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দুনিয়াতে একটি জান্নাত আছে। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে না, সে আখিরাতের জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। আমার শত্রুরা আমার কী ক্ষতি করতে পারবে? আমার বুকেই আমার জান্নাত। আমি যেখানেই যাই এটা আমার সাথেই থাকে। কখনো আমার থেকে আলাদা হয় না। আমার কারাগার নির্জনে প্রভুর ইবাদতের সুযোগ, আমার নিহত হওয়া শাহাদাত এবং দেশান্তরিত হওয়া আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণ।[১৩] সম্ভবত দামেস্কের অন্ধকার কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি উপরোক্ত কথা বলেছেন।

আপনি সাধারণ অশিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে এমন আন্তরিক স্থিরতা ও হৃদয়ের শান্তি দেখতে পাবেন, বড় বড় অমুসলিম চিন্তাবিদ, লেখক ও ডাক্তারদের কাছেই পাবেন না। জানা গেছে যে, অনেক অমুসলিম ডাক্তার মুসলিম রোগীদের চিকিৎসা করে অবাক হয়েছে। কথিত আছে যে, একজন অমুসলিম ডাক্তার জটিল রোগে আক্রান্ত একজন মুসিলম রোগীর চিকিৎসার তত্বাবধায়ক ছিল। সে জানতে পারলো যে, রোগীটি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে। রোগীটিকে কীভাবে এই সংবাদ দিবে, তা নির্ধারণে ডাক্তার ইতস্তবোধ করছিল। রোগীটি তার রোগের কথা জেনে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে, এই আশঙ্কায় সংবাদটি দেয়ার জন্য নানা কৌশল

[১৩] আল ওয়াবিলুস সাইয়্যিব, ইবনুল কাইয়্যিম, পৃষ্ঠা নং ৬৯।

অবলম্বন করছিল। অতঃপর যখন তাকে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার কথা বলা হলো, ডাক্তার তখন দেখলো যে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে, প্রশস্ত বক্ষে ও বিস্ময়কর প্রশান্তির সাথে সংবাদটি গ্রহণ করেছে। এই দৃশ্য দেখে ডাক্তার বিস্ময়ে অবাক হয়েছে।

অনুরূপভাবে তাক্বদীরের প্রতি মুসলিমদের ঈমান অনেক অমুসিলম জ্ঞানীকে অবাক করেছে। এ বিষয়ে তারা নিজেরাই সাক্ষী হয়ে অনেক লেখালেখি করেছে। তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাসী অমুসলিমদের মধ্য থেকে যারা মুসিলমদের তাক্বদীরে বিশ্বাস নিয়ে যারা বই রচনা করেছে, তাদের মধ্যে বৃটিশ গবেষক Ronald Victor Courtenay Bodley অন্যতম। তিনি বলেন, ১৯১৮ সালে আমি আমার চিরচেনা পৃথিবী পরিত্যাগ করে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির গ্রাম্য লোকদের সাথে বসবাস শুরু করলাম। আমি সেখানে একটানা সাত বছর পার করলাম। সেখানে আমি গ্রাম্য আরবদের ভাষা শিখে নিলাম। আমি তাদের পোশাক পরতাম, তাদের খাবার গ্রহণ করতাম এবং জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তাদের রীতি নীতিই গ্রহণ করলাম। সকাল বেলা তাদের সাথে ছাগল নিয়ে বের হতাম এবং তাদের মতই মরু ভূমির তাবুতেই ঘুমাতাম। এসময় আমি ইসলাম নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করলাম। এমনকি আমি ইসলামের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে একটি বই লিখে ফেললাম। বইটির নাম দিলাম "আর-রাসূল"।

মরুভূমির যাযাবরদের সাথে কাটানো সাতটি বছর ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দদায়ক, সুখ-শান্তিতে ভরপুর। আমি মরুচারী আরবদের কাছ থেকে শিখেছি, কীভাবে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিপদাপদের মোকাবেলা করতে হয়। তারা যেহেতু মুসলিম, তাই তারা তাক্বদীর ও আল্লাহর ফায়ছালায় গভীর বিশ্বাস রাখে। এই বিশ্বাস তাদেরকে নিরাপদ বসবাসে সাহায্য করে এবং জীবনকে সহজ করে দেয়। তারা কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া করে না এবং কোনো বিষয়েই উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হয়ে হতাশার সাগরে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করে না। তারা বিশ্বাস করে যা নির্ধারিত আছে তাই হবে। আল্লাহ যা লিখেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু হবে না। তবে এই কথার অর্থ এটা নয় যে, তারা বিপদ-বিপর্যয়ের সময় হাত গুঁটিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকে। কখনোই তারা এমনটা করে না; বরং তারা যে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তা থেকে পরিত্রাণের কিংবা তার ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

এ বিষয়ে তাদের সাথে মরুভূমিত বসবাস কালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। একদা প্রচণ্ড ঝড় বইতে লাগলো। বাতাস বাহিত

মরুর ধূলি-বালি ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম। গরমের প্রচণ্ডতায় আমি অনুভব করলাম যে, আমার মাথার চামড়া সিদ্ধ হয়ে চুলগুলো গোড়া থেকে উঠে যাবে এবং আমি গরমে পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। কিন্তু আমার সাথের আরবরা মোটেই অসুবিধা অনুভব করলো না। তারা শুধু মাথা নাড়িয়ে একটি কথাই বলল, قضاء مكتوب "যা লিখা আছে, তাই হবে"।

আর ঝড় শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে যোগ দিলো। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে তাদের ছোট ছোট ছাগলগুলো মারা যেতে পারে, তাই তারা এগুলো যবেহ করে ফেলল। অতঃপর তাদের পশুগুলো দক্ষিণ দিকে পানির কাছাকাছি চালিয়ে নিলো। এসব তাড়া করলো অত্যন্ত ধীরস্থির ও নিরবতার সাথে। তাদের কারো মুখ থেকে কোনো কষ্টের আওয়াজ শুনা যায়নি। ঝড় শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের গোত্র প্রধান বলল, আমরা বেশি একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আমরা তো সবকিছু হারানোর উপক্রম হয়েছিলাম। প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কৃতজ্ঞতা তাঁরই। আমাদের পশুপালের শতকরা ভাগই নিরাপদ রয়েছে। আমরা নতুনভাবে কাজ শুরু করতে সক্ষম।

বৃটিশ লেখক আরো বলেন যে, উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে থাকা কালে আমি আরেকটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা একবার মরুভূমিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন গাড়ির একটি চাকার টায়ার ফেটে গেলো। গাড়ির ড্রাইভার অতিরিক্ত চাকা আনতে ভুলে গিয়েছিল। আমি এতে খুব রাগান্বিত হলাম। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা আমাকে ঘিরে ফেলল। তখন আমি একজন গ্রাম্য আরবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের এখন করণীয় কী? তারা আমাকে জানিয়ে দিলো যে, এখন রাগান্বিত হয়ে কোনো লাভ নেই। এই মুহূর্তে ক্রোধ মানুষকে অস্থিরতা ও নির্বোধিতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। গাড়িটি তিন চাকার উপর ভর করেই চলতে লাগলো। কিছু দূর গিয়ে গাড়িটি থেমে গেলো। আমি তখন জানতে পারলাম যে, গাড়ির তেলও শেষ হয়ে গেছে। এতেও আমার কোনো আরব সাথী তেমন একটা প্রভাবিত হলো না। স্থিরতা ছিল তাদের উপর লক্ষণীয়। তারা এবার পায়ে হেঁটেই চলতে লাগলো।

মরুভূমির আরবদের সাথে বসবাস করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর মন্তব্য করলো যে, আমেরিকা-ইউরোপ যেসব মানষিক রোগী ও নেশাখোর-পাগলে ভরপূর হয়েছে, তা কেবল সভ্যতা ও শহুরে জীবনের ফলাফল। তাড়াহুড়া, দ্রুততা, উদ্বিগ্নতা, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতাই এর কারণ।

লেখক আরো বলেন যে, মরুভূমিতে বসবাস কালে আমি কখনো অস্থিরতা অনুভব করিনি। বরং আমি সেখানে আল্লাহর স্বর্গরাজ্যে বসবাস

করেছি, শান্তি পেয়েছি ও পরিতৃপ্ত হয়েছি। লেখকের সর্বশেষ কথা হচ্ছে, মোটকথা আফ্রিকার মরুভূমি ত্যাগ করেছি ১৭ বছর আগে। সেখানকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আজও আমি বুকে ধারণ করছি। আল্লাহর নির্ধারণের সামনে এখন আমি আরবদের নীতিই গ্রহণ করি। যেসব দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় থাকে না, সেগুলোকে আমি ধীরস্থিরতা ও স্বস্তির সাথে মোকেবালা করি। আরবদের কাছ থেকেই আমি এই স্বভাবটি অর্জন করেছি। বেদনানাশক ঔষধ ও ডাক্তারী প্রেসক্রিপশন আমার মেজাজকে যতটা শান্ত করতে না পারে, তার চেয়ে বেশি শান্ত করে আরব মুসলিম থেকে অর্জিত আমার এই অভ্যাস।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক হওয়ার দলীলসমূহ

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। এটা ঈমানের ষষ্ঠ ও সর্বশেষ রুকন। এর উপর কুরআন, সুন্নাত, ইজমা, ফিতরাত, বিবেক-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-অনুভূতি ভিত্তিক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

(১) কুরআনের দলীল: তাক্বদীরের উপর ঈমান আনয়ন আবশ্যক হওয়ার বহু দলীল কুরআনে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ "তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার একটি তাক্বদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন"। (সূরা আল ফুরকান: ২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ "আমি প্রত্যেক জিনিসকে একটি পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি"।[১৪] (সূরা কামার: ৪৯)

---

[১৪] অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ আছে। সে অনুসারে প্রত্যেক বস্তু একটা নির্দিষ্ট সময় অস্থিত্ব লাভ করে, একটা বিশেষ রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে। একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ লাভ করে, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টিকে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ স্বভাবগত নিয়ম-নীতি অনুসারে এ দুনিয়াটারও একটা 'তাকদীর' বা পরিমিতি ও অনুপাত আছে। সে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা চলেছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটতে হবে। এর পরিসমাপ্তির জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার এক মুহূর্ত পূর্বে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না কিংবা এক মুহূর্ত পরে তা অবশিষ্টও থাকবে না। এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী নয় যে, চিরদিনই তা আছে এবং চিরদিন থাকবে। কিংবা কোন শিশুর খেলনাও নয় যে, যখনই তোমরা চাইবে তখনই তিনি এটাকে ধ্বংস করে দেখিয়ে দেবেন। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ "এটিই আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর বিধান চূড়ান্ত ও স্থিরকৃত"। (সূরা আল আহযাব: ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾

"যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুঠাম করেছেন। যিনি তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর পথ দেখিয়েছেন"। (সূরা আলা: ২-৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

"তাদের বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক এবং ঈমানদারদের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত"। (সূরা আত তাওবা: ৫১)

(২) সুন্নাতের দলীল: ঈমান সম্পর্কে প্রশ্নকারীর জবাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহর উপর (২) তাঁর ফেরেশতাদের উপর (৩) তাঁর কিতাব সমূহের উপর (৪) তাঁর রাসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর"।[১৫]

হাদীছের শেষাংশে এসেছে, নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে উমার! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে? উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি হলেন জিবরীল। তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য"।[১৬]

---

[১৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

[১৬] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি এমন কাজে আগ্রহী হও, যা তোমার উপকার করবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। অপারগ হয়ো না। তোমার কোনো বিপদ হলে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম! বরং বলো এটাই আল্লাহর নির্ধারণ। তিনি যা চেয়েছেন করেছেন। কেননা যদি বলা শয়তানের দুয়ারকে উন্মুক্ত করে।[১৭]

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«قدر اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

“আল্লাহ্ তা‘আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিখে দিয়েছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে”।[১৮] আলোচনার মাঝে মাঝে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে অনেক দলীল সামনে আসবে।

(৩) ইজমার দলীল: তাক্বদীরের উপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে মুসলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তারা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ভালো-মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ হতে। ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অনেক অকাট্য দলীল, ছাহাবীদের ইজমা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অনেক আলেমের উক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাক্বদীরের উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।[১৯]

---

[১৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪।

[১৮] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৩।

[১৯] শারহু ছ্বহীহ মুসলিম, নববী, (১/১৫৫)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সালাফদের সকলের মতে সবকিছু আল্লাহর নির্ধারণ অনুপাতেই হয়ে থাকে।[২০]

(৪) ফিতরাতের (সৃষ্টিগত স্বভাব) দলীল: প্রাচীন ও বর্তমান সর্বযুগেই তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের বিষয়টি মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব দ্বারাই অবগত হওয়া গেছে। কিছু কিছু মুশরিক জাতি ছাড়া আর কেউ এটাকে অস্বীকার করেনি। তবে তারা তাক্বদীরকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেনি; তারা কেবল তাক্বদীরের বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে ভুল করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"যারা শির্ক করেছে, তারা অচিরেই বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শির্ক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধও করতাম না। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা মনে করেছিল"। (সূরা আল আন-আম: ১৪৮)

তারা আল্লাহর ইচ্ছা সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু তারা আল্লাহ ইচ্ছায় শির্ক হয় বলে দাবি করেছে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, এটাই ছিল তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা মনে করেছিল"। জাহেলী যুগের আরবরা তাক্বদীর সম্পর্কে জানতো এবং তারা এটাকে তারা অস্বীকারও করেনি। জাহেলী সমাজে এমন কেউ ছিল না, যে মনে করতো কোনো কিছুই পূর্বে নির্ধারিত হয়নি এবং সবকিছুই নতুনভাবে শুরু হয়। জাহেলী কবিরা তাদের কবিতায়ও তাক্বদীরের কথা উল্লেখ করেছে। জাহেলী কবি আনতারা ইবনে শাদ্দাদ বলেন,

يا عَبلُ أَينَ مِنَ المَنِيَةِ مَهرَبِي + إِن كانَ رَبّي في السَماءِ قَضاها

হে আবলা! আমার প্রভু তো আসমানের উপর থেকে আমার মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন, মৃত্যু থেকে আমার পলায়নের কোন সুযোগ আছে কী? কবি যুহাইর বলেন,

---

[২০] ফতহুল বারী, (১১/২৮৭)

فَلاَ تَكْتُمُنَّ اللهَ مَا فِي صُدُورِكُمْ + لِيَخْفَى، وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَمِ

يُؤَخَّرْ فَيُوضَعْ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ + لِيَوْمِ الْحِسَابِ، أَوْ يُعَجَّلْ فَيُنْقَمِ

তোমাদের অন্তরে খিয়ানত কিংবা গাদ্দারী সম্পর্কিত কিছু থাকলে তা গোপন করো না, যাতে তা মানুষের কাছে গোপন থাকে। গোপন বিষয় যতই গোপন করা হোক না কেন, আল্লাহ তা জেনে ফেলবেন। অতঃপর তিনি এর শাস্তি বিলম্বিত করবেন এবং আমলনামায় ক্বিয়ামত দিবসের জন্য লিখে রাখবেন অথবা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই প্রতিশোধ নিবেন। যী-কারের যুদ্ধের দিন হানী ইবনে মাসউদ তার প্রসিদ্ধ ভাষণে বলেছেন, সতর্কতা অবলম্বন তাক্বদীরের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে না।

অতএব জাহেলী যুগের কোনো আরব লোকই তাক্বদীরকে অস্বীকার করেনি। প্রসিদ্ধ আরব পণ্ডিত আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আরবদের কেউ তাক্বদীর অস্বীকার করেছে বলে আমার জানা নেই। আরবদের অন্তরে তো তাক্বদীর সম্পর্কে আপত্তি জাগে না। তিনি বললেন, আউযুবিল্লাহ! জাহেলী কিংবা ইসলামী উভয় যুগের আরবরাই তাক্বদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করে।

(৫) বিবেক-বুদ্ধির দলীল: পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধির অকাট্য দলীল সাব্যস্ত করে যে, এই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, পরিচালক-ব্যবস্থাপক ও মালিক একমাত্র আল্লাহ। এই চমৎকার ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও সুবিন্যস্ত-মিলপূর্ণ সৃষ্টিজগতে কোনো কিছুই হঠাৎ করে অস্থিত্বশীল হওয়া অসম্ভব। কেননা আকস্মিকভাবে হঠাৎ করেই যা অস্থিত্বশীল হয়, তা অস্থিত্বশীল হওয়ার শুরু থেকেই কোনো শৃঙ্খলার অধীনে থাকে না। অতএব, বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো অবস্থায় যা অস্থিত্ব ধারণ করে তা সুশঙ্খল হয়ে বিদ্যমান থাকে কীভাবে এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় কীভাবে? অতএব বিবেক-বুদ্ধির দাবিতে যখন প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহই এই সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা, তখন আবশ্যক হয়ে গেলো যে, স্রষ্টার রাজত্বে তাঁর ইচ্ছা ও নির্ধারণের বাইরে কোনো কিছু হওয়া অসম্ভব। বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সাব্যস্তকৃত এই বিষয়টি কুরআনের দলীল দ্বারাও সমর্থিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ এবং অনুরূপ পৃথিবীও। এগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, যাতে তোমরা জানতে পার যে, অবশ্যই

আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন"। (সূরা আত তালাক: ১২)

অতঃপর তাক্বদীরে বিস্তারিত বিষয়গুলো বিবেক-বুদ্ধি অস্বীকার করে না। বরং বিবেক-বুদ্ধি তার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

(৬) **অভিজ্ঞতার দলীল:** আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, শুনছি ও পাঠ করছি যে, তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করার মাধ্যমেই মানুষের যাবতীয় বিষয় ও কাজকর্ম সঠিক ও সুশৃঙ্খল হয়। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ সম্পর্কিত কিছু কথা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

মুমিনরাই সর্বাধিক সৌভাগ্যবান, সর্বাধিক ধৈর্যশীল, সর্বাধিক সাহসী, সর্বাধিক দানশীল, সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও সর্বাধিক বুদ্ধিমান। তাক্বদীরের প্রতি খাঁটি ও প্রকৃত বিশ্বাস না থাকলে তাদের জন্য এটা অর্জিত হতো না। অতএব তাওহীদের মাধ্যমেই মানুষের জীবন সুশৃঙ্খল, সঠিক ও সুবিন্যস্ত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তাওহীদেই রয়েছে মানব জীবনের শৃঙ্খলা। তাওহীদ ছাড়া মানুষের জীবন প্রকৃত পক্ষে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। আর তাক্বদীরের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কারো তাওহীদও সঠিক হয় না।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল গায়েবী বিষয়সমূহ থেকে এমন কিছু বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার কিছু কিছু বিষয় অতীতে সংঘটিত হয়ে গেছে। মুসলিমগণ স্বচক্ষে সেগুলো দেখেছে। যেমন হেজাজের বিশাল আগুন, ঘন ঘন বাজার, রোম ও পারস্য বিজয় ইত্যাদি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর ছাহাবীগণ তা দেখেছে এবং তা দেখে তাদের ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, তাক্বদীর সত্য। আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেটা যে সময় হবে বলে আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন, সেটা সে সময়ই সংঘটিত হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

৭) **বাস্তবতার দলীল:** আমরা এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি যে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও সম্পদ পাওয়া না পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষ কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণির মানুষের কাছে দুনিয়ার সম্পদ প্রচুর পরিমাণ রয়েছে, অন্যজনের কাছে রয়েছে কম। আবার কারো হাত একদম শূণ্য। কী আশ্চর্য ব্যাপার? দুনিয়ার সম্পদ লাভের চেষ্টা তো সবাই করছে। তারপরও এতো ব্যবধান কেন? মানব সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে,

যারা ধন-সম্পদ অর্জনের অনেক কলাকৌশল জানে। অর্থনীতি বিষয়ে তাদের কারো কারো পড়াশুনাও আছে। তারপরও তাদের সারাটা জীবন দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটনের মধ্যেই কেটে যাচ্ছে। অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে এমন মানুষ, যাদের কোনো শিক্ষা-দীক্ষা নেই অথচ তারা এত বেশি সম্পদের অধিকারী যে, তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদের হিসাব জানে না। তাক্বদীর যদি না-ই থাকতো, তাহলে এমনটা হতো না। চেষ্টা করে সবাই ধনী হয়ে যেতো। সম্পদ পাওয়ার সামান্য চেষ্টা করে যেহেতু কেউ সফল হচ্ছে, আবার একই চেষ্টা করে অন্যরা ব্যর্থ হচ্ছে কিংবা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাতে বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা আসলে বান্দার নিজের হাতে নয়। তা কেবল এক মহান পরাক্রমশালী ও বন্টনকারীর পক্ষ হতেই এমন ভাগাভাটিা হচ্ছে। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, রিযিক অন্যান্য বিষয়ে তাক্বদীর রয়েছে। আল্লাহ যার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করেছেন, সে ততটুকই পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"হে নাবী! তুমি বলো, আমার রবই যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না"। (সূরা সাবা: ৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

"আমিই পার্থিব জীবনে তাদের জীবনোপকরণ ভাগ করেছি এবং তাদের একজনকে অন্যজনের উপর মর্যাদা দিয়েছি"। (সূরা আয যুখরুফ: ৩২)

বর্ণিত হয়েছে যে, নজদ এলাকায় জারবু নামক এক দরিদ্র লোক বাস করতো। তার মাত্র একটি গাধা ছিল। গাধাটির উপর সে মানুষের মালপত্র বহন করে সামান্য জীবিকা অর্জন করে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কোনো মতে জীবন যাপন করতো। এভাবেই তার বছরের পর বছর পার হচ্ছিল। সে বারবারই একটি স্বপ্ন দেখতো। স্বপ্নে তাকে বলা হতো, ফিলিস্তীনের পবিত্র নগরী কুদুস শহরে তোমার রিযিক রয়েছে। সেখানে গেলে তোমার রিযিকের সংকীর্ণতা বিদূরীত হবে এবং তোমার ভাগ্যের উন্নয়ন হবে। একই স্বপ্ন বারবার দেখে লোকটি স্বপ্নের কথা তার স্ত্রীকে জানালো এবং উন্নত জীবনের সন্ধানে ফিলিস্তীন সফর করার দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করল। সে তার গাধাটি বিক্রি করে স্ত্রী-সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু ক্রয় করে খালি হাতে রিযিকের সন্ধানে ফিলিস্তীনের পথে রওয়ানা দিলো। ফিলস্তীন ছিল তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই সেখানে গিয়ে সে নগরীর পথে পথে দিশেহারা হয়ে

ঘুরছিল। হঠাৎ দেখলো, একলোক গাড়ী ভর্তি আঙ্গুর ফল নিয়ে যাচ্ছে। গাড়ী থেকে মালিকের অসতর্কতার কারণে হঠাৎ আঙ্গুরের দু'টি থোকা জারবুর সামনে পড়ে গেলো। জারবু গাড়ী ওয়ালাকে ডেকে বলল, ওহে লোক ওহে লোক! তোমার গাড়ী থেকে আঙ্গুরের দু'টি থোকা পড়ে গেছে। আঙ্গুর ওয়ালা জারবুকে বলল, তুমি তা নিয়ে নাও। এটা তোমার রিযিক। আঙ্গুর ওয়ালার কথা শুনে, জারবুর স্বপ্নের কথা মনে পড়লো। যে স্বপ্ন সে বহুবার দেখেছে। আঙ্গুর ওয়ালার কথা তার মাথায় বজ্রপাতের মত আঘাত করলো। সে মনে মনে হতাশ হয়ে বলল, আঙ্গুরের এই থোকা দু'টির জন্য নজদ থেকে ফিলিস্তীন এসেছি? এটাই কি আমার রিযিক? এটাই কি সেই রিযিক যা আমি বহুবার স্বপ্নে দেখেছি? এই বলে সে দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। আঙ্গুর ওয়ালা জারবুর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কী হয়েছে? এমন করছো কেন? আঙ্গুরের থোকা দু'টি নিয়ে নাও এবং খাও।

জারবু এবার বলল, আমি বহুবার স্বপ্নে দেখেছি, ফিলিস্তীনে আমার রিযিক রয়েছে। সেই রিযিকের সন্ধানে আমি নজদ থেকে ফিলিস্তীনে এসেছি। আঙ্গুরের এই থোকা দু'টিই কি আমার সেই রিযিক? এ কথা শুনে আঙ্গুর ওয়ালা লোকটির দিকে তাকিয়ে প্রচুর হাসলো এবং বলল, সব স্বপ্নই কী বিশ্বাস করতে হবে? আমি কতবার স্বপ্নে দেখেছি, নজদ এলাকায় জারবু নামক এক লোকের গাধার নীচে আমার জন্য গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আমি তা কখনো বিশ্বাস করিনি। নজদে সফরও করিনি।

আঙ্গুর ওয়ালার কথা শুনে জারবু দ্রুত বাড়ি ফিরে এলো। তার স্ত্রী অবাক হয়ে তাকে দ্রুত ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কী? তুমি কি ফিলিস্তীনে তোমার রিযিক পেয়েছো? জারবু তার স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করল না। সরাসরি তার গাধা শয়ন করার স্থানে গেলো। শাবল-কোদাল হাতে নিয়ে সে গাধা শয়ন করার জায়গাটি খনন করতে লাগলো। খননের এক পর্যায়ে সে বিরাট এক গর্ত দেখতে পেলো। গর্তের মধ্যে সে বহু গুপ্তধন পেয়ে গেলো। এতে জারবু ভাগ্যের উন্নয়ন হলো এবং উন্নত জীবন পেয়ে গেলো।

এই ঘটনা ভাগ্যের লিখনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তা অন্য কেউ নিতে পারবে না। যদিও তোমার মাঝে ও তার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকে। আর যেখানে তোমার রিযিক নাই, সেখানে গিয়ে শত চেষ্টা করেও তা পাবে না এবং যা তোমার ভাগ্যে নাই, তা তুমি কখনো পাবে না। যদিও তা তোমার পায়ের নীচে থাকে। অতএব তোমার রিযিক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো এবং আল্লাহর উপর ন্যস্ত করো। যা আছে, তা সন্তুষ্ট থাকাতেই প্রকৃত শান্তি। আল্লাহর প্রতি ভালো

ধারণা পোষণ করাই সর্বোত্তম রিযিক। জেনে রেখো, আকাশেই রয়েছে তোমাদের রিযিক, রয়েছে প্রতিশ্রুত সবকিছু"।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে সালাফদের কিছু উক্তি

সালাফদের থেকে এ বিষয়ে অনেক সুন্দ সুন্দর উক্তি রয়েয়ে। এগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করার তাৎপর্য এগুলোতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের গুরুত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে এগুলোতে। নিম্নে কিছু উক্তি আমরা উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো।

(১) সম্মানিত ছাহাবী উবাদা ইবনে সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ছেলে অলীদ ইবনে উবাদা বলেন, আমার পিতা উবাদা মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় আমি একদা তাঁর কাছে গেলাম। আমি তার মধ্যে মৃত্যুর আলামত দেখে বললাম, হে পিতা! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি তখন বললেন, আমাকে বসাও। পরিবারের লোকেরা যখন তাকে বসালো, তখন তিনি বললেন, হে আমার ছেলে, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ পাবে না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সম্পর্কে প্রকৃত ইলম অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। অলীদ বলেন, হে পিতা! আমি বললাম, তাক্বদীরের ভালো-মন্দ বুঝার কোনো উপায় আছে কী? তিনি তখন বললেন, তুমি জেনে রেখো যে, যা তুমি অর্জন করতে পারনি, তা অর্জন করার ছিল না। আর যা তুমি অর্জন করেছো, তা তোমার হাত ছাড়া হওয়ার ছিল না। হে আমার ছেলে! আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম কলমকে বললেন, তুমি লিখো। ঐসময়ই কলম ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, তা সবই লিখে ফেলেছে। হে আমা ছেলে! তুমি যদি উপরোক্ত বিশ্বাসের উপর না থেকে মৃত্যু বরণ কর, তাহলে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[২১]

(২) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তাক্বদীরের প্রতি ঈমান তাওহীদকে সুশৃঙ্খল করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস করবে অতঃপর তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করবে তার তাওহীদ পূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর একককত্বে বিশ্বাস করবে; কিন্তু তাক্বদীরকে অবিশ্বাস করবে, তার তাওহীদ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

---

[২১] মুসনাদ আহমাদ, (৫/৩১৭)।

(৩) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আরো বলেন, সবকিছুই তাক্বদীর অনুযায়ী হয়। এমনকি তোমার গালে হাত রাখাও।

(৪) ইকরামা বলেন, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সুলাইমান আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত পাখির মধ্য থেকে হুদহুদকে খুঁজলেন কেন? তিনি বললেন, একবার সুলাইমান আলাইহিস সালাম কোনো এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। তখন তিনি জানতে পারেননি, সেখান থেকে পানি কত দূরে? আর হুদহুদ ছিল পানি খুঁজে বের করার কাজে পারদর্শী। অর্থাৎ আকাশে বহু উপরে থেকেও সে যমীনের কোথায় পানি আছে, তা দেখতে পায়। এমনকি যমীনের কোন্ অংশে পানি তুলনামূলক কম গভীরে তাও সনাক্ত করতে পারে। ইকরামা বলেন, আমি বললাম, এটা কীভাবে সম্ভব? শিশু বাচ্চা সুতা দিয়ে ফাঁদ বানিয়ে তার উপর কয়েকটি দানা ফেলে সামান্য বালু দিয়ে সুতা ঢেকে রাখে। অতঃপর হুদহুদ সেখানে আসতেই শিশুর পাতা ফাঁদে আটকা পড়ে। হুদহুদ যদি মাটির নিচে পানি দেখতে পায়, তাহলে বালুর নিচে মাটির উপর ফাঁদ দেখে না কেন? ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, إذا جاء القدر أعمى البصر "যখন তাক্বদীর সামনে চলে আসে তখন চোখ অন্ধ হয়ে যায়"।

(৫) হাসান বাছরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে একটি পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের সময়কাল ভাগ করেছেন, রিযিক বন্টন করেছেন। এমনকি সুস্থতা ও অসুস্থতাও নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরো বলে, যে ব্যক্তি তাক্বদীর অস্বীকার করলো, সে ইসলামকেই অস্বীকার করলো। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ মানুষের বয়স নির্ধারণ করেছেন। মানুষের সুস্থতা নির্ধারণ করেছেন এবং অসুস্থতাও নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাক্বদীর অস্বীকার করবে, সে কুরআন অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন অস্বীকারকারী হবে, সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে।[২২]

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের দাবি

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) কে তাক্বদীর সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি এর লম্বা জবাব দিয়েছেন। এতে তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তাক্বদীর সম্পর্কিত সব বিষয় সংক্ষেপে

[২২] শরহু উসূলি আহলিস সুন্নাহ, (৪/৬৮২)।

বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে যা এসেছে এবং যার উপর ছিলেন এই উম্মতের প্রথম মুহাজির ও আনসারগণ এবং যার উপর ছিলেন উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারীগণ, তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। আর তা এই যে, আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সবকিছুর প্রভু ও মালিক। নিজে নিজেই অস্থিত্বশীল সমস্ত বস্তু এবং অস্থিত্বশীল সমস্তসমূহের সাথে প্রতিষ্ঠিত গুণাবলীও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। মানুষের এবং সৃষ্টির কাজও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা হয়। আর তিনি ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরত ব্যতীত কোনো কিছুই হয় না। তিনি যা করার ইচ্ছা করেন, কেউ তা ঠেকাতে পারে না। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা হবে, তিনি তা জানেন। আর যা সৃষ্টি হয়নি, তা সৃষ্টি হলে কেমন হতো, তাও তিনি জানেন।

বান্দার কাজও এর মধ্যে শামিল। তিনিই বান্দার কাজগুলো সৃষ্টি করেছেন। ভালো-মন্দ সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ছাড়া অন্যদের কাজও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাখলুক সৃষ্টি করার আগেই তাদের তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন, তাদের বয়স নির্ধারণ করেছেন, রিযিক নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের আমলও নির্ধারণ করেছেন। তিনি এগুলো লিখে রেখেছেন। সেই সঙ্গে তাদের সৌভাগ্যবান হওয়া কিংবা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার বিষয়টিও লিখেছেন। অতএব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা। প্রত্যেক জিনিসের উপরই আল্লাহ ক্ষমতাবান এবং যা সৃষ্টি হয়েছে, তার সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহরর ইচ্ছা। যা সৃষ্টি হয়েছে তা সৃষ্টি হওয়ার আগেই আল্লাহ তা জেনেছেন। তাঁর জ্ঞান অনুসারেই তিনি সবকিছু নির্ধারণ করেছেন ও সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তা লিখেছেন।

উম্মতের সালাফগণ আরো একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, বান্দা তাই বাস্তবায়ন করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকার আদিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে যা দেয়ার ওয়াদা করেছেন এবং অপরাধীদেরকে শাস্তির যেই ভয় দেখিয়েছেন, যেগুলোর বিবরণ এসেছে আল্লাহর কিতাবে ও রাসূলের সুন্নাতে আহলে সুন্নাতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে। তারা আরো একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ যা করেছেন এবং যা করেননি, সে বিষয়ে আল্লাহর কাছে কেউ যুক্তি-প্রমাণ চাওয়ার ক্ষমতা রাখে

না; বরং আল্লাহই বান্দার উপর চূড়ান্ত দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছেন। মানুষকেই তাদের কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, সালাফদের ইমামগণ আরো একমত পোষণ করেছেন যে, তাক্বদীরের প্রতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করার পাশাপাশি এটাই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা, তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা হয় এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা করে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন। তবে মানুষেরও ইচ্ছা এবং ক্ষমতা রয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছায় কাজ করে। আল্লাহ তাদেরকে যেই ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাতেই তারা কাজ করে। সেই সঙ্গে তারা বলে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত বান্দা কোনো ইচ্ছা করতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾

"কখনো নয়। এটি তো একটি উপদেশ। যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। এটি এমন সব কিতাবে লিখিত আছে, যা সম্মানিত উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র। এটি মর্যাদাবান ও পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে থাকে"। (সূরা আবাসা: ১১-১৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾

"কখনো নয়, অবশ্যই নেক লোকদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রয়েছে। আর তুমি কি জানো ইল্লিয়্যীনে কী? এটি একটি লিখিত কিতাব। সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণই তা প্রত্যক্ষ করে"। (সূরা মুতাফফিফীন: ১৮-২১)

তাক্বদীরের স্তরসমূহ

তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের চারটি রুকন রয়েছে। এগুলোকে তাক্বদীরের স্তর বলা হয়। তাক্বদীর সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝার জন্য এগুলোই হচ্ছে প্রধান ফটক স্বরূপ। এই স্তরগুলা সম্পর্কে ইলম অর্জন না করলে তাক্বদীরের প্রতি কারো ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এ স্তরগুলোর একটি অন্যটির সাথে

গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যে ব্যক্তি সবগুলো স্তরের স্বীকৃত প্রদান করবে, তাক্বদীরের প্রতি তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি কিংবা একাধিক স্তর অস্বীকার করবে তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। নিম্নে তাক্বদীরের স্তরগুলো আলোচনা করা হলো।

(১) العلم: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান।

(২) الكتابة: ইলম অনুযায়ী সবকিছু লিখে রাখা।

(৩) المشيئة: আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

(৪) الخلق: সৃষ্টি করা।

তাক্বদীরের প্রথম স্তর: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রথম স্তর হচ্ছে, এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা ছোট-বড় প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত রয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও অবগত থাকবেন। এগুলো আল্লাহ তা'আলার কাজের সাথে সম্পর্ক রাখুক অথবা বান্দার কাজের সাথে সম্পর্ক রাখুক। আল্লাহর ইলম সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। যা অতীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যা কিছু ভ্যবিষ্যতে অস্তিত্ব ধারণ করবে তা তিনি অবগত আছেন। এমনকি যা সৃষ্টি হয়নি, তা হলে কেমন হতো, তাও তিনি অবগত আছেন।

যা অস্তিত্বশীল হয়েছে, আল্লাহ তা অবগত আছেন। যা অস্তিত্বশীল হয়নি, তিনি তাও জানেন। আসমান ও যমীনের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর ইলমের বাইরে নয়।

সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার আগে থেকেই তিনি সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত আছেন। সৃষ্টির রিযিক, বয়স, কথা ও যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেও তিনি অবগত। সৃষ্টির চলাচল ও স্থির থাকা সম্পর্কেও তিনি রয়েছেন অবগত। কারা জান্নাতী ও কারা জাহান্নামী তাও তিনি জানেন। তাক্বদীরের এই স্তর তথা যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই ইলম রাখেন, এই বিষয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নাবী-রাসূল ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। ছাহাবীগণ এবং যারা এই উম্মতের মধ্য থেকে তাদের অনুসরণ করেছে, তারাই তাক্বদীরের এই স্তরের উপর ঈমান আনয়ন করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এই উম্মতের অগ্নিপূজক কাদারীয়া সম্প্রদায়ই কেবল এতে

মতভেদ করেছে। তাক্বদীরের এই স্তরের অনেক দলীল রয়েছে। সূরা হাশরের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত), তিনি رَحْمَانُ (পরম করুনাময়) এবং رَحِيمُ (অসীম দয়ালু)। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি مَلِك (মালিক), قُدُّوس (অতি পবিত্র), سَلَام (শান্তিদাতা), مؤْمِن (নিরাপত্তা দানকারী), مُهَيْمن (রক্ষাকারী), عَزِيز (পরাক্রমশালী), جَبَّار (প্রতাপশালী), مُتَكَبِّر (মহিমান্বিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, خَالِق (সৃষ্টিকারী), بَارِي (উদ্ভাবক) এবং مُصَوِّر (রূপদাতা), তাঁর জন্য রয়েছে অনেক সুন্দরতম নাম। আর তিনিই عَزِيز (মহাপরাক্রমশালী) ও حَكِيم(প্রজ্ঞাবান)"। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

"কাফেররা বলে, আমাদের উপর ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। হে নাবী! তুমি বলো, আমার রবের শপথ, তা তোমাদের উপর অবশ্যই আসবে। তিনি গায়েবের সকল খবর রাখেন। তার কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোনো জিনিস আকাশসমূহে লুকিয়ে নেই এবং পৃথিবীতেও না। অণুর চেয়ে বড়ই হোক, কিংবা তার চেয়ে ছোটই হোক, সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখা আছে"। (সূরা সাবা: ৩)

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১২৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

"তাদের সামনে কোন আয়াত এলে তারা বলে, আল্লাহর রাসূলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তা আমাদের দেয়া হবে ততক্ষণ আমরা ঈমান আনবো না। আল্লাহ নিজের রিসালাত কাকে দিবেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই সর্বাধিক অবগত আছেন"। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"হে নাবী! হিকমাত এবং উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে"। (সূরা আন নাহল: ১২৫)[২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়, জল ভাগের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি শস্য দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আল আন-আম: ৫৯)

---

[২৩] **সত্য প্রকাশের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে বিতর্কের কিছু আদব:** এটি যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই ও মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। আলোচনায় পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্য দ্বারা প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের গলাবাজী করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্য হবে না। বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ করতে হবে। যুক্তি-প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সংগত ও হৃদয়গ্রাহী। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুঁয়েমী এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ না দেখা দেয়। সোজাসুজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, প্রতিপক্ষ কূটতর্কে লিপ্ত হওয়াকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে তখন তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে হবে। যাতে সে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায় আর না হয় তার ভ্রষ্টতা দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ "তাদেরকে যদি আগের জীবনের দিকে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে তারা আবার সে আমলই করবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল"। (সূরা আল আনআম: ২৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾ "যদি আল্লাহ জানতেন এদের মধ্যে সামান্য পরিমাণ কল্যাণ আছে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনার তাওফীক দিতেন। (সূরা আল আনফাল: ২৩)

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার ছ্বহীহতে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বলেছেন,

«اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»

"আল্লাহই অধিক জানেন বড় হয়ে তারা কী আমল করতো"।[২৪]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার ঠিকানা কোথায়, তা জানা যায়নি। জান্নাতে না জাহান্নামে? অর্থাৎ বনী আদমের কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে তা জানা আছে। আল্লাহ তা'আলা তা জানেন এবং সেই অনুযায়ী লিখে রেখেছেন।

তাক্বদীরের দ্বিতীয় স্তর: ইলম অনুযায়ী সবকিছু লিখে রাখা: অর্থাৎ এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার যেই জ্ঞান পূর্ব হতেই বিদ্যমান রয়েছে, তার আলোকে তিনি সবই লাওহুল মাহফুযে লিখে ফেলেছেন। ছাহাবী, তাবেঈ ও আহলে সুন্নাতের সমস্ত আলেমের ঐক্যমতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করবে, তা সবই উম্মুল কিতাব তথা লাওহুল মাহফুযে লিখা হয়েছে। লাওহুল মাহফুযের আরো নাম রয়েছে। যেমন আল-ইমামুল মুবীন, আয্-যিক্র, আল-কিতাবুল মুবীন ইত্যাদি। তাক্বদীরের দ্বিতীয় স্তর তথা লিখার স্তরের উপর অনেক দলীল রয়েছে। দলীলগুলোর কিছু রয়েছে কুরআনে এবং বাকীগুলো রয়েছে পবিত্র সুন্নাতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

[২৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৮৫।

"আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর শুক্র থেকে এরপর তোমাদের জোড়ায় পরিণত করেছেন অর্থাৎ পুরুষ ও নারী। কোন নারী গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে কেবল আল্লাহর জানা মতেই তা করে থাকে। কোন আয়ু লাভকারী আয়ু লাভ করলে এবং কারো আয়ু কিছু কম করা হলে তা অবশ্যই একটি কিতাবে লেখা থাকে। আল্লাহর জন্য এসব একদম সহজ"। (সূরা ফাতির: ১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

"আমি প্রত্যেক জিনিস সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে রেখেছি"। (সূরা ইয়াসীন: ১২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

"তাদের বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমাদের ঘটবে না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক এবং ঈমানদারদের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত"। (সূরা আত তাওবা: ৫১) আল্লাহ তা'আলা মূসার দু'আ সম্পর্কে বলেন,

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

"আমাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ লিখে দাও। (সূরা আল আ'রাফ: ১৫৬) আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের সাথে মূসার বিতর্ক সম্পর্কে বলেন,

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥١) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

"ফেরাউন বলল, তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী? মূসা বললেন, এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার প্রতিপালক বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না"। (সূরা তোহা: ৫১-৫২)

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

“আল্লাহ্ তা‘আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিখে দিয়েছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে”।[২৫] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

“আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেন, লিখো। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ বললেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রতিটি বস্তুর তাক্বদীর লিখো”।[২৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন,

«يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الأقلام، وجفت الصحف»

“হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাবো। তুমি আল্লাহর হকসমূহের সংরক্ষণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর অধিকার সমূহের হেফাযত করো। তাহলে তুমি আল্লাহকে সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে। জেনে রাখ! দুনিয়ার সব মানুষ মিলেও যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তথাপি তারা শুধু তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা মিলিত হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তথাপি তারা শুধু সেই পরিমাণ ক্ষতিই করতে পারবে, যা আল্লাহ তা‘আলা তোমার উপর লিখে রেখেছেন। যা কিছু লিখার ছিল তা লিখার পর

[২৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৫৩, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র।

[২৬] দেখুন: আবু দাউদ হা/৪৭০০, তিরমিযী হা/২১৫৫, বায়হাকী এবং অন্যান্য।

কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পুস্তকে লিখার পর কালি শুকিয়ে গেছে”।[২৭] ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার পর হাসান ছ্বহীহ বলেছেন।

আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ وقد كتب الله مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ: شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً». قال فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فقال مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثم قَالَ: اعملوا فكل ميسر لما خلق له «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ الآيَةَ.

“আমরা বাকী গোরস্থানের একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং বসলেন। আমরাও তাঁর চার পাশে বসে গেলাম। তাঁর হাতে ছিল ছোট্ট একটি লাঠি। তিনি নীচের দিকে মাথা ঝুঁকালেন এবং লাঠি দিয়ে যমীনে আঘাত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়নি এবং এও লিখা হয়নি যে, সে সৌভাগ্যবান না হতভাগ্য। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি নির্ধারিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেব না? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আমাদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান সে তো অবশ্যই সৌভাগ্যবানদের ন্যায় আমল করবে। আর আমাদের মধ্যে যে হতভাগ্য হিসাবে লিখিত তারা অচিরেই হতভাগ্যদের ন্যায় কাজ করবে। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক মানুষকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই আমল সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন,

[২৭] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৫১৬। মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহক্বীকসহ মিশকাত, হা/৫৩০২।

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

"যে ব্যক্তি দান করে ও তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে অচিরেই আমি তার জন্য সহজ পথকে আরো সহজ করে দিব। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করলো ও বেপরোয়া হলো এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করলো, অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিবো কঠিন পরিণামের পথ"। (সূরা আল লাইল: ৫-১০)[২৮]

তাক্বদীরের তৃতীয় স্তর: এই স্তরের দাবি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কার্যকর ইচ্ছা ও ব্যাপক ক্ষমতার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। আর এই বিশ্বাস করা যে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই নড়ে না এবং স্থিরও হয় না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ হিদায়াত পায় না এবং গোমরাও হয় না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবী-রাসূলের ঐক্যমতে এই স্তরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা যত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, তাতেও এর প্রমাণ রয়েছে। মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব এবং বুদ্ধিভিত্তিক ও বর্ণনা ভিত্তিক দলীলও এটা সাব্যস্ত করে।

কুরআন ও সুন্নাতে এর অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ "তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচন করেন। (সূরা কাসাস: ৬৮) আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেন, ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ "তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না"। আল্লাহ তা'আলা সূরা দাহারের ৩০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যদি আল্লাহ না চান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

[২৮] ছহীহ বুখারী, হা/১৩৬২।

"কখনো তুমি কোনো বিষয়ে বলো না যে, আমি ওটা আগামীকাল করবো, ইনশা-আল্লাহ এই কথা না বলে। (সূরা কাহাফ: ২৩-২৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

"আমি যদি তাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ করতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলতো এবং প্রত্যেক বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করতাম, তবুও তারা ঈমান আনয়ন করতো না। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সে কথা ভিন্ন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ"। (সূরা আল আনআম: ১১১)

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ৩৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন"।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১২৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন। যাতে মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা করছে"। অর্থাৎ জোর খাটিয়ে যেমন আকাশের দিকে উঠা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ যার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন তার মধ্যে ঈমান ও তাওহীদের আলো ঢুকানো অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে না দেয়া পর্যন্ত তাতে ঈমান ও তাওহীদ প্রবেশ করে না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন"।

ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»

“বনী আদমের অন্তরসমূহ মাত্র একটি হৃদয়ের মত আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে থাকে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা এটাকে ঘুরান। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু‘আ পাঠ করলেন,

«اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»

“হে আল্লাহ! হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার আনুগত্যের উপর ধাবিত করো।”।[২৯]

আর আল্লাহ তা‘আলার কার্যকর ইচ্ছা ও ব্যাপক ক্ষমতা ঐ সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবায়িত ও পরিলক্ষিত হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যা আগামীতে বাস্তবায়িত হবে। আর যা অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং যা আগামীতে অস্তিত্ব লাভ করবেও না, তাতে আল্লাহর ইচ্ছা না থাকার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহর ইচ্ছা না থাকার কারণেই ভবিষ্যতে তা অস্তিত্ব লাভ করবে না। আল্লাহ যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা আল্লাহর ক্ষমতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যা সৃষ্টি হয়নি, তাতে আল্লাহর ইচ্ছা না থাকার কারণেই সৃষ্টি হয়নি। এমনটি নয় যে, তাতে আল্লাহর ক্ষমতা না থাকার কারণে সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى

“আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকেই হিদায়াতের উপর একত্রিত করতে পারতেন”। (সূরা আল আনআম: ৩৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

“আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে রাসূলদের পরবর্তীরা তাদের নিকট পরিষ্কার নিদর্শনসমূহ আসার পর কখনো পরস্পর লড়াই করত না।

[২৯] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৪।

কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তাদের কেউ ঈমান এনেছে, আর কেউ কাফের হয়েছে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পরে লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন"।[৩০] (সূরা আল বাকারা: ২৫৩)

অতএব, তাদের যুদ্ধ না করা আল্লাহর ক্ষমতা না থাকার কারণে নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিয়ে যুদ্ধ করাতে সক্ষম নয় বলে তারা যুদ্ধ করেনি; বরং তাদের যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা না থাকার কারণেই যুদ্ধ হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসের ৯৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

"যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন, তাহলে যমীনের সবাই ঈমান আনয়ন করতো। তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য লোকদের উপর জবরদস্তি করবে? আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾

---

[৩০] অর্থাৎ রাসূলদের মাধ্যমে দীন ও তাওহীদের জ্ঞান লাভ করার পর মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং মতবিরোধ থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক হানাহানি ও রক্তপাত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এর কারণ এই ছিল না যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ অক্ষম ছিলেন এবং এই মতবিরোধ ও হানাহানি থেকে মানুষকে বিরত রাখার শক্তি তার ছিল না। তিনি চাইলে নবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাধ্য কারো থাকতো না। কেউ কুফরী ও বিদ্রোহের পথে চলতে পারতো না। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিপর্যয় ঘটানোর ক্ষমতা কারো থাকতো না। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্প ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটি বিশেষ কর্মনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করা তাঁর ইচ্ছাই ছিল না। তিনি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই তাকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও বাছাই করার স্বাধীনতা দান করেছেন। নবীদেরকে তিনি মানুষের উপর দারোগা বানিয়ে পাঠাননি। কাজেই জোর-জবরদস্তি করে তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তারা করেননি। বরং নবীদেরকে তিনি পাঠিয়েছেন যুক্তি-প্রমাণের সাহায্য মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আব্বান জানানোর জন্য। কাজেই যত বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, তার পিছনে এই একটি মাত্র কারণ রয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন আর ইচ্ছার অপব্যবহার করে মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোর কারণ এই ছিল না যে, আল্লাহ তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চালানোর ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু (নাউযুবিল্লাহ) এ ব্যাপারে সফলকাম হতে পারেননি। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

"তোমার রব ইচ্ছা করলে সমগ্র মানব জাতিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারতেন,[৩১] কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে। তবে তোমার রব যাদের উপর রহমত করবেন, একমাত্র তারাই মতভেদ থেকে বাঁচবে"। (সুরা হুদ: ১১৯)

তাক্বদীরের চতুর্থ স্তর: এই স্তরের দাবি হচ্ছে এই বিশ্বাস করা যে, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা যেমন আল্লাহ তেমনি এগুলোর বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও চাঞ্চল্যতা, নড়াচড়া এবং স্থিরতারও তিনি স্রষ্টা। আরো বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর সৃষ্টি। এগুলো ছিল না। তার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং অস্তিত্ব দিয়েছেন।

সমস্ত আসমানী কিতাবেই তাক্বদীরের এই স্তরের বিবরণ এসেছে এবং প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সমস্ত রাসূল এর উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সুদৃঢ় সৃষ্টিগত স্বভাব ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাও এটি সমর্থিত। তাক্বদীরের এই স্তরের দলীলগুলো বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ "আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা"। (সূরা আয যুমার: ৬২) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

---

[৩১] পশু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্টির মত মানুষকেও প্রকৃতিগতভাবে একটি নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে এবং সেই পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো পথে সে চলতে পারবে না, মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এটা কখনোই চাননি। যদি এটাই তাঁর ইচ্ছা হতো, তাহলে ঈমানের দাওয়াত, নবী-রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষ মুমিন ও মুসলিম হিসাবে সৃষ্টি হতো এবং কুফরী ও পাপাচারের কোনো সম্ভবনাই থাকতো না। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন যে, তাঁকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। তারপর প্রত্যেক মানুষকে ভালো বা মন্দ যে কোনো একটি পথ নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়ে তার উপর চলবে। এর ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রচেষ্টা ও উপার্জনের ফল হিসাবেই জান্নাত লাভ করবে কিংবা শাস্তি ভোগ করবে। ঈমানের উপর সকল মানুষকে বাধ্য করলে মানুষ সৃষ্টির পিছনে যেই হিকমতে ইলাহী রয়েছে, তাও বাস্তবায়ন হতো না। অর্থাৎ পরীক্ষা করা সম্ভব হতো না। সেই সঙ্গে ঈমানের উপর বাধ্য করে মানুষকে ছাওয়াব দেয়ারও কোনো অর্থ হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা সকলকে এক জাতিতে পরিণত না করে, তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেই মানুষ তাওহীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হচ্ছে। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আল আনআম: ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি ছয়দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন, তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। এমন কোন শাফা'আতকারী নেই, যে তার অনুমতি ছাড়া শাফা'আত করতে পারে। আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তারই ইবাদত করো। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?"। (সূরা ইউনুস: ৩) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

"এবং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। (সূরা লুকমান: ২৫) অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে লোক সকল! ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমেই তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে"। (সূরা আল বাকারা: ২১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে"। (সূরা আল আম্বীয়া: ৩৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো স্রষ্টা আছে কি, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রুযী দান করেন?" (সূরা ফাতির: ৩)

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾

"তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল"। (সূরা মূলক: ২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ "এবং তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার একটি তাক্বদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন"। (সূরা আল ফুরকান: ২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ "অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আস সাফ্ফাত: ৯৬)

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) خلق أفعال العباد "বান্দার কাজ-কর্মের সৃষ্টি" নামক অধ্যায়ে হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পেশাদার ও তার পেশা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ ও তার কাজ-কর্ম সৃষ্টি করেন।[৩২]

এই হচ্ছে তাক্বদীরের চারটি স্তর। এগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত তাক্বদীরের প্রতি কারো ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। সেই সঙ্গে এগুলো ব্যতীত কারো তাওহীদও পরিপূর্ণ হবে না।

বান্দার কাজ-কর্মের স্রষ্টা কে?

যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ ﴾ "আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা"। (সূরা আয যুমার: ৬২) এর মধ্যে বান্দার কাজ-কর্মও শামিল। অতএব, বান্দার কাজ-কর্মও আল্লাহর সৃষ্টির বাইরে নয়। কারণ, উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে অর্থের যে ব্যাপকতা রয়েছে, তা হতে বান্দার কাজ-কর্মকে বের করার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে কিছু মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে বিধায় এখানে বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি।

---

[৩২] ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: খালকু আফআলিল ইবাদ।

এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, বনী আদমের সব কাজ, চাই সেগুলো সৎকাজ হোক কিংবা পাপাচার হোক, সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দার মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন এবং যা আগামীতে সৃষ্টি করবেন তা তিনি সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই অবগত রয়েছেন। বান্দারা যা করে আল্লাহ তা আগে থেকেই অবগত আছেন। লাওহুল মাহফুযে তিনি সেটা লিখেও রেখেছেন। তবে সৃষ্টি করা, নির্ধারণ করা ও লিখা অর্থ বাধ্য করা নয়। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। বান্দাদের মধ্যে তারই ফায়ছালা কার্যকর হয়। বান্দারা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে থাকে। আল্লাহ যাদের জন্য সৌভাগ্য লিখেছেন, তাদেরকে তিনি হিদায়াত করেন। যাদের জন্য দুর্ভাগ্য লিখেছেন, তাদেরকে তিনি বিভ্রান্ত করেন।[৩৩] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে হিদায়াত কবুল করার ইচ্ছা, শক্তি, যোগ্যতা ও ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন। যারা এসব কিছুর সঠিক ব্যবহার করে এবং নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কল্যাণকর কাজের দিকে ধাবিত করে ও নাবী-রাসূলদের দীন কবুল করার প্রতি অগ্রসর হয় এবং আল্লাহর কাছে অন্তর-জবান দিয়ে হিদায়াত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন। তাদেরকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করেন এবং সৌভাগ্যবান করেন। অপর পক্ষে যারা কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয় না এবং নাবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেই দীন পাঠিয়েছেন, তার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না; বরং তারা তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয়, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জোর খাটিয়ে কল্যাণ ও হিদায়াতের পথে আনেন না। কারণ, বাধ্য করে হিদায়াতের পথে আনয়ন করলে আল্লাহ তা'আলা যেই উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ তাদেরকে পরীক্ষা করা সম্ভব হতো না। তিনি তাদেরকে জোর করে হিদায়াতের পথে না এনে শাস্তি স্বরূপ আরো বেশি গোমরাহ করেন। যাতে আখিরাতে তারা আরো কঠিন শাস্তি ভোগ করতে পারে। এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

[৩৩] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় হিদায়াত কবুল করার বা না করার যেই ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন, তার সঠিক ব্যবহার করে যে ব্যক্তি আল্লাহর পছন্দনীয় ইচ্ছা মোতাবেক চলে এবং অন্তর-মন দিয়ে আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে হিদায়াতের পথে অগ্রসর করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নবী-রাসূল পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহর দেখানো পথে চলে না, বরং ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করে বিভ্রান্তির পথে চলে আল্লাহ তাকে শাস্তি ও ন্যায়-ইনসাফের দাবি স্বরূপ গোমরাহীর পথেই অগ্রসর করেন। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)

"আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন"। এই অর্থে অন্যান্য আয়াতের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা এটাই। আয়াতের তাৎপর্য এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কুফরীর উপর মানুষকে বাধ্য করেন। কারণ বাধ্য করে পাপ কাজ করিয়ে শাস্তি দিলে ন্যায় বিচারের পরিপন্থি হয়। আর বাধ্য করে ছাওয়াবের কাজ করিয়ে উত্তম প্রতিদান দিলে সেটা অনর্থক ও অর্থহীন কাজ হয়। আল্লাহ তা'আলা যুলুম ও অনর্থক কাজ করার বহু উর্ধ্বে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

তিনি জান্নাতীদের সংখ্যা অবগত আছেন এবং তাদের জন্য জান্নাতীদের আমল সহজ করে দেন। তিনি জাহান্নামীদের সংখ্যাও অবগত আছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নামীদের আমলও সহজ করে দেন।

অতএব আল্লাহ তা'আলাই বান্দার কাজ-কর্ম সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন। আর বান্দা তা সম্পন্ন ও অর্জন করে। আল্লাহই বান্দার কাজ-কর্মের স্রষ্টা। বান্দা কেবল তা সম্পন্ন করে। কুরআন ও সুন্নাহর যেসব দলীল প্রমাণ করে যে, বান্দার কাজ-কর্ম এবং সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা, আমরা সেসব দলীল-প্রমাণের প্রতি ঈমান রাখি। আমরা আরো বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রত্যেক কাজ-কর্ম ও গুণাবলীর উপর ক্ষমতাবান। সেই সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর যেসব দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, বান্দা প্রকৃতপক্ষেই তার ভালো-মন্দ সবকাজই সম্পন্ন করে, আমরা সেগুলোর প্রতিও বিশ্বাস করি। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাক্বদীরের চতুর্থ স্তর সম্পর্কে আলোচনা করার সময় যেসব দলীল উল্লেখ করা হয়েছে, তা এ কথাই সাব্যস্ত করে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীলটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ "অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আস-সাফ্ফাত: ৯৬)

এখানে যেই "ما" শব্দটি এসেছে, তার অর্থ সম্পর্কে তাফসীর কারকদের থেকে দু'টি মত পাওয়া যায়। প্রথম মতটি হচ্ছে "ما" শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কাজ সৃষ্টি করেছেন। আর দ্বিতীয় "ما" শব্দটি ইসমুল মাওসূল الذي অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা নিজ হাতে যেসব মূর্তি সৃষ্টি করে থাকো, তারও স্রষ্টা আল্লাহ। অতএব উপরোক্ত আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, মানুষের স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, তেমনি তার কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ।

তাক্বদীরের প্রকারভেদ

التقدير العام ব্যাপক তাক্বদীর:

এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সমস্ত সৃষ্টির তাক্বদীর নির্ধারণ করার নাম। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সব সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত আছেন, সবকিছু লিখে রেখেছেন, সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। এই প্রকার তাক্বদীর শুধু মানুষের সাথে খাছ নয়; বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি হবে, তার সবকিছুই এর মধ্যে রয়েছে। এই প্রকার তাক্বদীরের অনেক দলীল রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়"। (সূরা আল হজ্জ: ৭০)

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

"আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিখে দিয়েছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে"।[৩৪]

অঙ্গিকার গ্রহণের দিবসে সমগ্র মানব জাতির তাক্বদীর নির্ধারণের দলীল কী?

التقدير البشري: সমগ্র মানব জাতির তাক্বদীর একসঙ্গে নির্ধারণ:

এটা শুধু মানুষের সাথে খাছ। অঙ্গিকার গ্রহণের দিবসে সমগ্র মানব জাতির তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। এই দিবসে তিনি সমগ্র মানব জাতির কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তিনিই তাদের একমাত্র প্রভু। এই মর্মে তিনি তাদেরকে নিজেদের উপর সাক্ষী রেখেছেন। এতে তিনি সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান সকলের তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। এর অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

[৩৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৫৩, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র।

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন, তোমার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী থাকলাম"। (সূরা আল আরাফ: ১৭২)

ইসহাক ইবনে রাহুওয়াই বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কে কী আমল করবে তা কী নতুনভাবে শুরু হয়? না পূর্বেই ফায়ছালা ও নির্ধারিত হয়ে গেছে? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তনদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানালেন। অতঃপর তাদের সকলকে স্বীয় হাতের মুষ্ঠিতে নিয়ে বললেন, এরা জান্নাতের অধিবাসী আর এরা জাহান্নামের অধিবাসী। সুতরাং জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতের আমল সহজ করে দেয়া হবে আর জাহান্নামীদের জন্যে জাহান্নামের আমল সহজ করে দেয়া হবে।[৩৫]

মুআত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা উমার ইবনুল খাত্তাবকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো,

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী থাকলাম। (এই স্বীকৃতি ও সাক্ষী গ্রহণ এই জন্যে যে) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পার আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম"। (সূরা আল আরাফ: ১৭২)

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তাঁর পৃষ্ঠদেশে হাত বুলালেন। অতঃপর তার পৃষ্ঠদেশ

---

[৩৫] দেখুন দুর্‌রুল মানছুর ফিত্ তাফসীরিল মা'ছুর, (৩/৮৪৩) তাফসীরে ইবনে কাছীর, (২/২২৯) ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন সিলসিলায়ে ছ্বহীহা হা/১৬৮।

হতে তাঁর সন্তনদেরকে বের করে বললেন, আমি এদেরকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি। জাহান্নামীদের আমলের ন্যায়ই এরা আমল করবে।[৩৬]

তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর হাতে ছিল দু'টি কিতাব। তিনি বললেন, তোমরা কি জান এ কিতাব দু'টির বিষয়বস্তু কী? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জানি না, তবে আপনি যদি আমাদেরকে জানিয়ে দেন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন, এই কিতাবটি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে। তাতে রয়েছে পিতার নাম ও গোত্রের নামসহ সমস্ত জান্নাতবাসীর নাম। অতঃপর তাদের সর্বশেষ নাম লিখার পর যোগফল নামানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে বাড়ানো বা তাদের মধ্য হতে কাউকে কমানো হবে না। তারপর বাম হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন, এই কিতাবটি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে। তাতে রয়েছে পিতার নাম ও গোত্রের নামসহ সমস্ত জাহান্নামীর নাম। অতঃপর তাদের সর্বশেষ নাম লিখার পর যোগফল নামানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে বাড়ানো বা তাদের মধ্যে হতে কাউকে কমানো হবে না। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ব্যাপারটি যদি এরকমই হয়ে থাকে, তাহলে আমলের প্রয়োজন কী? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা সঠিক পথের উপর অটল থাক এবং নিকটবর্তী হও। কেননা জান্নাতবাসীর শেষ পরিণতি হবে জান্নাতীদের আমলের মাধ্যমে। এর পূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন। আর জাহান্নামীর শেষ পরিণতি হবে জাহান্নামবাসীর আমলের মাধ্যমে। এরপূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন। অতঃপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং কিতাব দু'টি ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাদের প্রতিপালক বান্দাদের বিষয়টি সমাপ্ত করে ফেলেছেন। একদল জান্নাতী এবং অন্যদল জাহান্নামী।[৩৭]

---

[৩৬] ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটি তাক্বদীর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী কিতাবুত্ তাফসীরে উল্লেখ করে বলেন, হাদীছটি হাসান। তবে ইমাম আলবানী যঈফ বলেছেন। দেখুন যিলাযল জান্নাহ, হা/১৯৬।

[৩৭] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ গরীব। ইমাম আলবানী হাদীছটি ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, (২/৫২৮)

التقدير العمري সারা জীবনের তাক্বদীর:

আত-তাক্বদীরুল উমরী, যা মাতৃগর্ভে বীর্য থেকে সন্তান তৈরী হওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয়। এর বহু দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾

"তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন, তিনি যখন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং এ সময় তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ হিসেবে ছিলে। অতএব তোমরা নিজেদের প্রশংসা করো না। তিনি ভালো জানেন কে মুত্তাকী-আল্লাহভীরু"। (সূরা আন নাজম ৩২)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا)

"তোমাদের কারো সৃষ্টির অবস্থা এই যে, সে তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিনে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিনে তা মাংশ পিন্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময় তাকে চারটি বিষয় লিখার নির্দেশ দেয়া হয়: (১) সে কী পরিমাণ রিযিক পাবে। (২) বয়স কত হবে। (৩) কর্ম কী হবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য। শপথ সেই আল্লাহ্‌র! যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তোমাদের কেউ জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় তাক্বদীরের লিখন তাকে অতিক্রম করে ফেলে। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের মত আমল করে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে।

এমনিভাবে তোমাদের কেউ জাহান্নামবাসীদের মত আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় (তাক্বদীরের) লিখন সামনে চলে আসে। অতঃপর সে জান্নাতবাসীদের মত আমল করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।[৩৮] এ হাদীছটি ছাড়াও এ বিষয়ে একদল ছাহাবী থেকে আরো ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো হাদীছের ভাবার্থ একই।

التقدير السنوي বাৎসরিক তাক্বদীরঃ

প্রতি বছর লাইলাতুল কদরে বাৎসরিক তাক্বদীর লিখিত হয়। এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

"আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা হয় আমার আদেশক্রমে। আমি তো প্রেরণকারী"। (সূরা দুখানঃ ৩-৫)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, পূর্ণ এক বছরে যা হবে তা লাওহে মাহফুয্ থেকে লাইলাতুল কদরে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন কারো মৃত্যু, জন্ম, রিযিক, বৃষ্টি এমনকি হাজীদের সংখ্যাও নির্ধারণ করা হয়। বলা হয় অমুক অমুক এ বছর হাজ্জ করবে। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, মুকাতিল আবু আব্দুর রাহমান এবং অন্যান্য আলেম থেকে এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে।[৩৯]

التقدير اليومي দৈনন্দিন তাক্বদীরঃ

দৈনন্দিন তাক্বদীর নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

"তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহান কার্যে রত আছেন"। (সূরা আর্-রাহমান। ২৯)

---

[৩৮] ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ বাদ্উল খাল্ক, অনুচ্ছেদঃ ফেরেশতাদের আলোচনা, হা/২৯৬৯, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র, হা/২৬৪৩।

[৩৯] ছ্বহীহুল হাকেম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাফসীর।

মুস্তাদরাকুল হাকেমে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি সৃষ্টি হচ্ছে লাওহে মাহ্ফুয। সাদা মুক্তা দিয়ে আল্লাহ্ এটি তৈরী করেছেন। তার উভয় পার্শ্ব তৈরী করা হয়েছে লাল রঙ্গের হিরা দিয়ে। কলমটি হচ্ছে নূরের তৈরী, কালিও নূরের। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে দৈনিক তিনশত ৬০ বার দৃষ্টি দেন। প্রত্যেকবার দৃষ্টি দেয়ার সময় তিনি কোনো না কোন বস্তু সৃষ্টি করেন, কারো জীবিকার ব্যবস্থা করেন, কাউকে জীবিত রাখেন, কাউকে মৃত্যু দেন, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে অপমানিত করেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। এটিই হচ্ছে আল্লাহর বাণীর অর্থ: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ "তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহান কার্যে রত আছেন"। (সূরা আর্-রাহমান: ২৯)

এ সমস্ত তাক্বদীর পূর্বোল্লোখিত বিস্তারিত তাক্বদীরের মতই। সেটি হচ্ছে তাক্বদীরে আযালী বা চিরস্থায়ী তাক্বদীর, যা কলম সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তা'আলা কলমকে লাওহে মাহ্ফুযে লিখার আদেশ দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমেই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আল্লাহর নিম্নবাণীর ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম"। (সূরা জাসিয়া: ২৯) আর এ সবকিছুই আল্লাহর ইল্ম থেকে, যা মহান আল্লাহর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত।

সমস্ত আসমানী কিতাব এবং নাবীদের সুন্নাতসমূহ এ ব্যাপারে একমত যে, পূর্বেই তাক্বদীরের লিখন আমল করার প্রতিবন্ধক নয়।[৪০] তেমনিভাবে তাক্বদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকাকেও আবশ্যক করে না; বরং চেষ্টা ও পরিশ্রম করার প্রতি এবং সৎআমল করার প্রতি উৎসাহ যোগায়। এ কারণেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে পূর্বেই তাক্বদীর লিখা, তা বাস্তবায়ন হওয়া এবং কলম শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। এগুলো শুনে কোন কোন ছাহাবী বলে উঠলেন, তাহলে কি আমরা আমল ছেড়ে দিয়ে তাক্বদীরের লিখার উপর ভরসা করে বসে থাকব না? উত্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। বরং আমল করতে

---

[৪০] লিখে দিয়েছেন অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে কেবল লিখন অনুযায়ীই জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যেতে বাধ্য করা হবে। বরং এর অর্থ হলো, সৎ আমলের মাধ্যমে কে জান্নাতে যাবে আর খারাপ আমলের কারণে কে জাহান্নামে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তা আগে থেকেই অবগত আছেন।

থাক। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তার আমল সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করলেন, ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ "অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয়"। (সূরা আল লাইল: ৫)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন এবং তাক্বদীরের লিখন বাস্তবায়ন করার জন্য অসংখ্য উপকরণ তৈরী করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কাজ করার পথ সহজ করতে তিনি যে উপকরণ সৃষ্টি করেছেন তাতে তিনি মহা প্রকৌশলী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য সেই পথই সহজ করে দিয়েছেন, যার জন্য তাঁকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

বান্দা যখন জানতে পারবে যে, আখিরাতে তার জন্যে নির্ধারিত কল্যাণ অর্জন করতে হলে তাকে অবশ্যই সৎকর্ম সম্পাদন করতে হবে, তখন সৎকাজে তথা আখিরাতের কল্যাণ অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করবে। শুধু তাই নয়; বরং দুনিয়ার জীবিকা ও স্বার্থ অর্জনের চেয়ে আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক শ্রম ব্যয় করবে।

তাক্বদীরের হাদীছগুলো শুনে ঐ ছাহাবী তাক্বদীরের বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল, যিনি বলেছিলেন, "আজ থেকে আমি পূর্বের চেয়ে আরো অধিক পরিশ্রম (আমল) করবো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ

"যে বিষয়টি তোমার উপকারে আসবে, তা অর্জনে সচেষ্ট হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, অপারগতা প্রকাশ করো না।[৪১]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যখন বলা হল আমরা তো ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করি এবং ঝাড়-ফুঁক করি। এটা কি তাক্বদীরের কোন কিছু পরিবর্তন করতে পারে? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "এটিও অর্থাৎ চিকিৎসা করা ঝাড়-ফুঁক করাও আল্লাহ্ তা'আলার তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত"।[৪২] মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলা কল্যাণ-অকল্যাণ সবই নির্ধারণ করেছেন এবং উভয়টি অর্জনের উপকরণ তৈরী ও

---

[৪১] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র। ইবনে মাজাহ হা/৭৯।

[৪২] যঈফ: ইবনে মাজাহ হা/৩৪৩৭। তিরমিযী, হা/২১৪৮, অধ্যায়: কিতাবুত তিব্ব। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ।

নির্ধারণ করেছেন।

তাক্বদীরের বিষয়ে বান্দার করণীয় কী?

তাক্বদীরের বিষয়ে বান্দার করণীয় হচ্ছে, সে আল্লাহর ফায়ছালা ও নির্ধারণের উপর ঈমান রাখবে। সেই সঙ্গে আল্লাহর শরী'আত, আদেশ ও নিষেধের প্রতিও বিশ্বাস রাখবে। কুরআন ও হাদীছে তাক্বদীর সম্পর্কে যেই খবর দেয়া হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং শরী'আতের আদেশ মেনে চলবে। সে যখন সৎকাজ করার তাওফীক পাবে, তখন আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তার দ্বারা যখন অন্যায় কাজ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সে বিশ্বাস করবে যে, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহর নির্ধারণ ও ফায়ছালা অনুপাতেই হয়েছে। কেননা আদম আলাইহিস সালাম যখন গুনাহ করেছেন, তখন সাথে সাথে তাওবা করেছেন। আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেছেন এবং সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আর ইবলীস তাওবা করতে অস্বীকার করেছে এবং বিতর্ক করেছে। ফলে আল্লাহ তাঁকে অভিশাপ করেছেন এবং তাঁকে বিতারিত করেছেন। অতএব পাপ কাজ করার পর যে তাওবা করবে, সে আদমের সন্তান মানুষ বলে গণ্য হবে। আর যে পাপকাজ করার পর অহংকার করবে ও তাক্বদীর দিয়ে দলীল দিবে সে ইবলীস বলে গণ্য হবে। অতএব সৌভাগ্যবানগণ তাদের পিতাদের পথ অনুসরণ করে। আর দুর্ভাগ্যবানরা ইবলীসের অনুসরণ করে।

তাক্বদীরের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান ও এর সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকার আবেদরূপে পরিণত হয়। ফলে সে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও ছ্বলেহীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্য এসব বন্ধুই যথেষ্ট। মোটকথা, উপরে আলোচিত তাক্বদীরের চারটি স্তরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। এমন কোনো বিষয় সৃষ্টির মধ্যে সংঘটিত হয় না, যে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত থাকেন না। আল্লাহ তা জেনেছেন, লিখেছেন, তা হওয়ার ইচ্ছা করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। সে আরো বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তাই সে আনুগত্যের কাজ করবে এবং অবাধ্যতা বর্জন করবে। আল্লাহ যখন তাকে সৎকাজ করার তাওফীক দিবেন তখন সে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং আনুগত্যের পথে অবিচল থাকবে। আর তাকে যদি সৎকাজ করার তাওফীক দেয়া না হয় এবং তাকে আনুগত্যের পথে চলতে যদি সাহায্য না করে নিজের নফসের উপর ছেড়ে দেয়ার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে

এবং তাওবা করবে।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের দাবি এটা নয় যে, সে দুনিয়ার জন্য কাজ করবে না। বান্দা অবশ্যই বিশ্বাস করবে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কল্যাণ আল্লাহর হাতেই। এই বিশ্বাস তাকে হাতগুঁটিয়ে বসে থাকার প্রতি উৎসাহিত করবে না; বরং সে দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করবে। দুনিয়া অর্জনের জন্য সে সঠিক পথ অবলম্বন করবে। যমীনে ভ্রমণ করবে এবং জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পথ অবলম্বন করবে। সে যদি উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে এই জন্য আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর যদি এর বিপরীত কিছু হয়, তাহলে সে তাক্বদীর ও আল্লাহর ফায়ছালা মেনে নিয়ে নিজেকে সান্তনা দিবে। সে এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস করবে যে, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। সে যা অর্জন করতে পেরেছে, তা তার থেকে ছুটে যাওয়ার ছিল না এবং যা তার হাত থেকে ছুটে গেছে, তা পাওয়ার ছিল না।

আর বান্দা যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন এবং যার আদেশ করেছেন, তাতে অবশ্যই বিরাট হিকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে। অতঃপর তাক্বদীরের প্রতি বান্দার ইলম ও ঈমান যখন বৃদ্ধি পাবে, তখন সে আল্লাহর হিকমত ও রহমত থেকে এমন কিছু জানতে পারবে, যা তার বিবেক-বুদ্ধিকে অবাক করে দিবে। তখন সে আল্লাহর কিতাবের সংবাদের সত্যতা জানতে পারবে। প্রত্যেক মানুষকেই তাক্বদীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা জরুরী নয়। বরং এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ইলমই যথেষ্ট। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের মতে সক্ষমের উপর যা আবশ্যক অক্ষমের উপর তা আবশ্যক নয়। আল্লাহর অশেষ রহমতে শরী'আতের দলীল, স্বভাবগত দলীল, বুদ্ধিভিত্তিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দলীলগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক নয় ও এগুলোর মধ্যে কোনো সন্দেহও নেই।

তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু সংশয় এবং তার জবাব

প্রথম সমস্যা ও সংশয়: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান কী বান্দার স্বেচ্ছায় কাজ-কর্ম সম্পাদন করার প্রতিবন্ধক? তাক্বদীরে বিশ্বাস কী তার এখতিয়ার ও ইচ্ছাকে খর্ব করে? এক কথায় মানুষের কোনো নিজস্ব ইচ্ছা আছে কি? না কি তার সবকাজ আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়?

জবাব: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান বান্দার কাজের ইচ্ছাকে ছিনিয়ে নেয় না। তার কাজ করার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা থাকারও পরিপন্থি নয়। এমনকি সে কোনো কাজই আল্লাহর অবগতির বাইরে করে না। শরী'আতের দলীল দ্বারা যেমন এটা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেও এটা সুসাব্যস্ত। বান্দার কাজ-কর্মে বান্দার নিজস্ব ইচ্ছা থাকে। কুরআন ও হাদীছে এই মর্মে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾

"এটি একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে"। (সূরা দাহর: ২৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ "তোমাদের স্ত্রীদের সাথে তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সহবাস করো"। (সূরা আল বাকারা: ২২৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ "যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক"। (সূরা কাহাফ: ২৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾

"কখনো নয়। এটি তো একটি উপদেশ। যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। এটি এমন সব কিতাবে লিখিত আছে, যা সম্মানিত উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র। এটি মর্যাদাবান ও পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে থাকে"। (সূরা আবাসা: ১১-১৬)

বাস্তবেও আমরা প্রত্যেকেই অনুধাবন করতে পারছি যে, আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে এটা আল্লাহর ইচ্ছা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়। আমাদের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ "তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না"।

অতএব বান্দার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে। এটা দ্বারা যে কাজ করে অথবা কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে। আমরা কোন্ কাজটা আমাদের ইচ্ছায় করি এবং

কোন্ কাজটা আমাদের অনিচ্ছায় হয়, -তার মাঝে আমরা পার্থক্য করতে পারি। যেমন আমরা চলাফেরা করি, পায়ে হাঁটি, গাড়িতে আরোহণ করি। এই কাজগুলো আমাদের ইচ্ছা ক্ষমতার দ্বারা হয়। আমরা গাড়িতে উঠি। কেউ এটা অনুভব করি না যে, অন্য কেউ আমাদেরকে পিছন থেকে ঠেলে উঠাচ্ছে। ক্ষুধা-পিপাসা লাগলে আমরা খাবার ও পানীয় গ্রহণ করি। এগুলো আমাদের ইচ্ছাতে হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা এগুলো পূর্ব থেকেই অবগত থাকেন। তাঁর অবগতি আমাদেরকে এগুলো করতে বাধ্য করে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি কুফুরী করে ও পাপাচারিতায় লিপ্ত হয় তার বিষয়টিও অনুরূপ। সে নিজের ইচ্ছায় কাজ করে বলে সেই তার কাজের জন্য প্রশংসিত কিংবা নিন্দিত হয়।

অপরপক্ষে আমাদের অনেক কাজ আমাদের অনিচ্ছায় হয়। যেমন আমরা জ্বরে কাঁপি, কেউ উপর থেকে পড়ে যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল করে, শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়, কেউ লম্বা হয় কেউ খাটো হয়, এসব কাজে আমাদের কোন ইচ্ছা বা এখতিয়ার কিংবা কোনা ক্ষমতা থাকে না। আমরা এগুলো ঠেকানোর ইচ্ছা করলেও আমরা এগুলো ঠেকাতে পারি না। কারণ, এগুলো আমাদের অনিচ্ছায় এবং আল্লাহর একক ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়।

আর যেই কাজগুলোর প্রতি আমাদের ইচ্ছাশক্তি ধাবিত করি এবং আমরা নিজের শক্তি দিয়ে যেই কাজগুলো করি, তা আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা ও শক্তিতে হয় না। বরং আমাদের ইচ্ছা ও শক্তি আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির অধীনে। তিনি আমাদেরকে ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন বলেই আমরা তা দ্বারা আমরা কাজ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে ইচ্ছা করে তার জন্য। তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে কোনোই ইচ্ছা করতে পারো না"। (সূরা তাকবীর: ২৭-২৯)

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুর রাহমান ইবনে সা'দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বান্দা যখন ছ্বলাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং অন্যান্য ভালো আমল করে অথবা সে যখন কোনো পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন সে নিজেই সেই সৎকাজটির সম্পাদক হিসেবে গণ্য হয়। পাপাচারে লিপ্ত হলেও অনুরূপ। তার উপরোক্ত কাজ নিঃসন্দেহে তার এখতিয়ারেই হয়ে থাকে। সে

অবশ্যই অনুভব করে যে, সে তার কাজের উপর বাধ্য নয়। অথবা কাজটি না করতেও সে বাধ্য নয়। সে ইচ্ছা করলে কাজটি বর্জনও করতে পারতো।

এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। এ বিষয়টিই আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও সৎ আমল সম্পাদনকারীর দিকেই সৎকাজের সম্বন্ধ করেছেন এবং পাপাচারের প্রতি পাচারের সম্বন্ধ করেছেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেনে যে, সৎকাজগুলো বান্দারাই করে। এই জন্যই তারা সৎকাজের জন্য প্রশংসিত হয় ও ছাওয়াবপ্রাপ্ত হয়। আর যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তারাই নিন্দিত হয় এবং এর জন্য তারাই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, বান্দাদের কাজ বান্দাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং তাদের এখতিয়ারে হয়। তারা যখন ইচ্ছা করে তখন কাজ করে এবং যখন ইচ্ছা করে কাজ বর্জন করে। এটা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতা দ্বারাও সাব্যস্ত। শরী'আতের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আমরা দেখছিও তাই।

উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা কি তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা করার পরিপন্থি?

উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান ও ভরসা করার পরিপন্থি নয়; বরং তাক্বদীরের উপর ভরসা করার পাশাপাশি উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার মাধ্যমেই তাক্বদীরের প্রতি ঈমাণ পরিপূর্ণ হয়। এই জন্যই তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস করার সাথে সাথে আমল করা আবশ্যক। নাজাতের পথ অবলম্বন করা এবং আল্লাহর কাছে এ পথে চলতে সাহায্য চাওয়া আবশ্যক। আল্লাহ যেন তাকে সৌভাগ্যের পথে চলা সহজ করে দেন এবং সাহায্য করেন, এই দু'আ করা আবশ্যক।

কুরআন ও সুন্নাতের অনেক দলীলেই পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শরী'আত সমর্থিত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার আদেশ এসেছে। আমাদেরকে আমল করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও পাথেয় সংগ্রহ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অতঃপর ছ্বলাত সম্পন্ন হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা আল জুমুআ: ১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর উপর বিচরণ কর এবং তোমরা তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। আর তার দিকেই তোমাদের পুনরুত্থান। (সূরা মুলক: ১৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"তোমরা তাদের মুকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভয় দেখাবে। (সূরা আল আনফাল: ৬০)

আল্লাহ তা'আলা হজ্জের সফরে বের হওয়ার সময় মুসাফিরদেরকে পাথেয় নিয়ে বের হওয়ার আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى "আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। আল্লাহর ভীতিই হচ্ছে সর্বোত্তম পাথেয়"। (সূরা আল বাকারা: ১৯৭)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট দু'আ করা ও তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমরা আমার কাছে দু'আ করো। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ "তোমরা ছ্ববর ও ছ্বলাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। (সূরা আল বাকারা: ৪৫)

আল্লাহ তা'আলা শরী'আত সম্মত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম। যেমন তিনি

ছ্বলাত কায়েম, যাকাত আদায়, ছিয়াম পালন ও হজ্জ করার আদেশ দিয়েছেন। এগুলো তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জন করার মাধ্যম ও উপায়।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত ছাহাবীগণ এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নেককার আলেম ও আবেদদের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই যে, তারা সকলেই উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছেন এবং সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সারাটা জীবন তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং যুদ্ধ-জিহাদে অতিবাহিত করেছেন।

শাইখ আব্দুর রাহমান আস-সা'দী বলেন, অনেক মানুষ মনে করে যে, বিপদাপদ থেকে সতর্কতা অবলম্বন ও জীবন-যাপনের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের পরিপন্থি। যারা বলে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের পরিপন্থি, তাদের কথা মারাত্মক ভুল। বরং এটা তাক্বদীরের প্রতি বাতিল বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। সেই সঙ্গে এটা আল্লাহ তা'আলা যেই উদ্দেশ্যে শরী'আত পাঠিয়েছেন, তাও বাতিল করে দেয়। যারা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করাকে আমলের পরিপন্থি মনে করে, তারা আসলে বলতে চায় যে, শরী'আত সম্মত ও সৃষ্টিগত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা ছাড়াই এমনিতেই হয়ে যাবে। এটা যেন উপায়-উপকরণকে অস্বীকারের নামান্তর।

আসলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির এক জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে বেঁধে দিয়েছেন, একটি দিয়ে অন্যটিকে সুশৃঙ্খল করেছেন এবং একটির মাধ্যমে অন্যটি সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণকে পানাহারের সাথে দিয়েছেন এবং সন্তান সৃষ্টি করাকে নারী-পুরুষের বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ওহে উপায়-উপকরণ গ্রহণকে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থির ধারণাকারীগণ! তোমরা কি মনে করো যে, ফাউন্ডেশন ছাড়াই বিল্ডিং তৈরি হয়? যমীন চাষ করা ও বীজ বপন করা ছাড়াই ফল ও ফসল উৎপাদন করা যায়? বিবাহ করা ছাড়াই সন্তান জন্ম গ্রহণ করে? ঈমান ও আমল ছাড়াই জান্নাতে যাওয়া যাবে? কুফরী ও পাপাচার ছাড়াই কি কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে? এগুলোর কোনোটাই উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ করা ব্যতীত হয় না। তবে আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা বলে এগুলো করতে পারেন। তিনি কখনো কখনো উপায়-উপকরণ ছাড়াই ফলাফল তৈরী করেন। কিন্তু এটা তাঁর সাধারণ রীতি-নীতির বাইরে। কখনো কখনো তিনি তাঁর ক্ষমতা ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ স্বাভাবিক নিয়মের বাহিরে কিছু কিছু ঘটনা ঘটান। তবে সৃষ্টির মধ্যে এটা তাঁর সুন্নাত ও নিয়ম নয়। যারা বলে, ভালো ফলাফল লাভের জন্য তাক্বদীরের প্রতি ঈমানই যথেষ্ট, পরিশ্রম

করার দরকার নেই, তারা আসলে তাক্বদীরের প্রতি ঈমানকে বাতিল করে দিয়েছে এবং সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার হিকমতও বাতিল করে দিয়েছে। হে তাক্বদীরের প্রতি মিথ্যা ঈমানের দাবিদার! তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হিকমত ও কুদরতের দাবিতেই ফলাফল লাভের জন্য কাজ-কর্ম নির্ধারণ করেছেন এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পথ-পন্থা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ও বিবেক-বুদ্ধির মধ্যে এ সম্পর্কিত জ্ঞান ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার শরী'আতেও এ বিষয়ে আদেশ এসেছে। বাস্তবেও এটা তিনি কার্যকর করেন। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকেই উপযুক্ত রূপ দিয়েছেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যই উপযুক্ত উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন ও বিভিন্ন প্রকার উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার কৌশল শিখিয়েছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয়কে তিনি চমৎকার অভিনব পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন। এই সুন্দর-সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ হিকমতের সাক্ষ্য দেয়। তিনি এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমলকারীদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতির জন্য আমলের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছেন এবং উৎসাহীদেরকে সৌভাগ্য লাভের উৎসাহ দিয়েছেন।

অতএব আখিরাতের সৌভাগ্যকামী যখন জানতে পারবে যে, ঈমান ও সৎ আমল সম্পাদন এবং তার বিপরীত বিষয় পরিত্যাগ করা ব্যতীত পরকালে সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব নয়, তখন সে ঈমান বাস্তবায়ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং প্রত্যেক সৎ আমল করার প্রতিই মনোযোগী হবে। সেই সঙ্গে সে ঈমানের বিপরীত কিছু করে থাকলে ও পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়ে থাকলে তা থেকে তাওবা করতে মোটেই বিলম্ব করবে না।

কৃষক ভালোভাবেই জানে যে, যমীন চাষ করা, তাতে পানি দেয়া, বীজ বপন করা এবং নিয়মিত পরিচর্যা করা ব্যতীত ফসল পাওয়া যায় না। তাই সে ভালো ফসল পাওয়ার জন্য যা কিছু করণীয়, তা করতে মোটেই অলসতা করে না। যা কিছু তার ফসলের জন্য ক্ষতিকর, তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ক্ষতিকর পোঁকামাকড় হত্যা করার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করে।

ঈমানদারের ঈমানকে একজন আদর্শ কৃষকের সুন্দর একটি বাগানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কৃষক প্রতিদিন তার বাগানে প্রবেশ করে, পরিচর্যা করে, যত্ন নেয় ও পানি ঢেলে বাগানের সজীবতা বৃদ্ধি করে। তাতে আগাছা লক্ষ্য করলে সাথে সাথে তা উঠিয়ে বাগানের বাইরে ফেলে দেয়।

এতে তার বাগানের সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায়। কৃষক তার আশান্বিত ফসল ও ফসল সংগ্রহ করে চক্ষু শীতল করে।

অনুরূপ ঈমানদার তার ঈমানের বাগানের সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখবে। তাকওয়া ও সৎ আমল বৃদ্ধি কারক আমলের মাধ্যমে তার ঈমানের বাগানটিকে সুন্দর থেকে অতি সুন্দরে উন্নীত করবে। কৃষকের বাগানে গজিয়ে উঠা আগাছার মতই তার ঈমানে শির্ক-বিদ'আত ও পাপাচারের কদর্যতা ও আগাছা উঁকি দিতে পারে। মুমিন ব্যক্তি সেগুলো সনাক্ত করে তা হৃদয় থেকে সরিয়ে বহুদূরে নিক্ষেপ না করলে তার ঈমানে ভেজাল সৃষ্টি হতে পারে। ফলে সে আখিরাতে এর সুফল থেকেও বঞ্চিত হতে পারে।

শিল্পপতি যখন জানতে পারে যে, বাজারে ভালো মানের পণ্যের চাহিদা রয়েছে, তখন সে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এই জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করে। যে পুরুষ সুন্দর পরিবার কঠিন করার নিয়্যাত করে, সন্তান কামনা করে সে এজন্য চেষ্টা করে। দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়গুলো আসলে এরকমই।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বান্দাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন না করে যদি ভাগ্যের লিখনের উপর নির্ভর করে বসে থাকে, তাহলে এটাই তার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে যায় এবং সে দুর্ভাগ্যবান হয়। তার কথাটা আসলে ঐ ব্যক্তির কথার মতই, যে বলে আমি খাবো না, পান করবো না। আল্লাহ তা'আলা যদি আমার ভাগ্যে পরিতৃপ্ত হওয়া ও ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ হওয়া লিখে থাকেন, তাহলে খাবার গ্রহণ করা ছাড়াই অবশ্যই আমার ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ হবে। অন্যথায় খাবার গ্রহণ করলেও ক্ষুধা-পিপাসা দূর হবে না। অথবা তার কথাকে ঐ ব্যক্তির কথার সাথেও তুলনা করা যেতে পারে, যে বিবাহ করার পর বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবো না। আল্লাহ তা'আলা যদি আমার ভাগ্যে সন্তান লিখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সন্তান হবে।

অনুরূপ যে ব্যক্তি তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা করার অযুহাত পেশ করে আল্লাহর কাছে দু'আ করা ও সাহায্য চাওয়া এই ভেবে বাদ দেয় যে, এটা হচ্ছে আল্লাহর খাছ বান্দাদের কাজ, সেও মূর্খ ও বিভ্রান্ত। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি এমন কাজে নিমগ্ন হও, যা তোমার উপকার করবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। অপারগ হয়ো না। তোমার কোনো বিপদ হলে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম! বরং বলো এটাই আল্লাহর নির্ধারণ। তিনি যা চেয়েছেন করেছেন। যদি শব্দটি শয়তানের দুয়ারকে উন্মুক্ত করে।[৪৩]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে উপকারী কাজ করার আদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সৌভাগ্য অর্জনার্থে কাজ না করে অপারগতা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিয়েছেন যে, যখন বিপদাপদ আসবে এবং কোনো প্রিয় বস্তু ছুটে যাবে, তখন যেন মুমিন ব্যক্তি নিরাশ না হয়। বরং সে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান সুদৃঢ় করবে এবং বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে দিবে। কেননা এটা ছাড়া সে অন্য কিছু করতে সক্ষম নয়। যেমন কোনো কোনো জ্ঞানী লোক বলেছেন, দুনিয়ার সমস্ত বিষয় দুইভাগে বিভক্ত।

(১) এমন বিষয়, যা উপায়-উপকরণ ও কলা-কৌশল ব্যবহার করে অর্জন করা যায়।

(২) এমন বিষয়, যাতে কোনো কলা-কৌশল ফলদায়ক হয় না।

যা উপায়-উপকরণ ও কলা-কৌশল অবলম্বন করে অর্জন করা যায়, তা অর্জন করাতে অপারগতা প্রকাশ করা নিষেধ। আর যাতে কোনো কলা-কৌশল খাটে না, তা অর্জিত না হলে পাওয়ার জন্য অস্থির হওয়া, ব্যথিত হওয়া ও কষ্ট পাওয়া নিরর্থক। এটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণও বটে।

তাক্বদীরের উপর ভরসা করে যারা আমল বর্জন করে, তাদের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের বাণী পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

---

[৪৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪।

«كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

"আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিখে দিয়েছেন"।[৪৪] তিনি আরো বলেছেন,

مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ وقد كتب الله مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ: شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً.

"এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়নি এবং এও লিখা হয়নি যে, সে সৌভাগ্যবান না হতভাগ্য"।[৪৫]

যিনি উপরোক্ত হাদীছ দু'টি বলেছেন, তিনিই তো বলেছেন, তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক মানুষকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য তা সহজ করে দেয়া হবে"। অতএব আমরা কিতাবের কিছু অংশ মানবো, আর কিছু অংশের প্রতি কুফরী করবো?

তাক্বদীর দ্বারা দলীল পেশ করে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া কিংবা আমল বর্জন করার পরিণতি

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া কিংবা আমল বর্জন করার সুযোগ করে দেয় না। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তইমীয়া (রহমাহুল্লাহ) বলেন, তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে ও তাক্বদীরের অযুহাত পেশ করে পাপকাজে লিপ্ত হওয়া অবৈধ। এই মর্মে মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে, সমস্ত আসমানী শরী'আতের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও জ্ঞানীদের জ্ঞান সহমত পোষণ করেছে। কেননা তাক্বদীরের দলীল দিয়ে যদি অন্যায়-অপকর্ম করা সমর্থনযোগ্য হতো, তাহলে যে কারো জন্য খেয়াল- খুশি মোতাবেক কাজ করা অন্যায় হতো না। কেউ খুন করতো। অতঃপর শাস্তির সম্মুখীন হলে তা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করতো, কেউ অন্যের ধন-সম্পদ লুট-পাট করতো। অতঃপর তাক্বদীরের দলীল পেশ করতো। এই অযুহাতে যদি মানুষের কৃত অপরাধের বৈধতা

[৪৪] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৩, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র।

[৪৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৭, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র। ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৬২।

দেয়া হতো এবং অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া হতো, তাহলে মানুষ অপরাধ করতো আর তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করতো। পরিণামে পৃথিবীতে এক ভয়াবহ ফাসাদ সৃষ্টি হতো, মানুষের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা থাকতো না। এ জন্যই পৃথিবীর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এটাকে সমর্থন করে না। বিশ্বের কোনো আদালতই অপরাধীর তাক্বদীরের দলীল শুনতে চায় না। কোনো অপরাধী এই দলীল দিলেও তাকে রেহাই দেয় না।

কথিত আছে যে, এক চোরকে ন্যায়পরায়ণ খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট হাজির করা হলো। সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে যখন চোরের হাত কাটার ফায়ছালা দেয়া হলো, তখন চোর বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জানেন না, সবকিছুই তাক্বদীর অনুযায়ী হয়? অতএব আমি চুরি করেছি তাক্বদীর অনুযায়ী। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আমরা তোমার হাতও কাটবো তাক্বদীর অনুযায়ী। অতএব, পাপকাজে লিপ্ত হওয়া কিংবা সৎ আমল বর্জন করা যেহেতু এক শ্রেণির অজ্ঞ মানুষের লেংড়া অযুহাতে পরিণত হয়েছে এবং শয়তানও যেহেতু তাদেরকে নিয়ে খেল-তামাশা করার সুযোগ পেয়ে গেছে, তাই এটাকে বাতিল হিসেবে সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা নিম্নে কুরআন-সুন্নাত, বুদ্ধিভিত্তিক ও বাস্তব ভিত্তিক কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করবো। এগুলোর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে কিংবা আনুগত্যের কাজ বর্জন করে তাক্বদীরের দলীল পেশ করা সম্পূর্ণ বাতিল।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, বলেন,

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾

"মুশরিকরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও শির্ক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা মনে করেছিল। অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বলো, তোমাদের নিকট কোনো ইলম আছে কি? থাকলে আমাদের নিকট তা পেশ করো। তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং শুধু অনুমান ভিত্তিক কথাই বলে থাকো। সূরা আল আন'আম ৬:১৪৮

অতএব মক্কাবাসী মুশরিকরা তাদের শির্কের উপর তাক্বদীরের দলীল পেশ করেছিল। শির্ক ও পাপাচারের উপর যদি তাক্বদীরের অযুহাত পেশ

গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতেন না।

২) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

"সুসংবাদ দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আন নিসা: ১৬৫)

পাপাচারের উপর তাক্বদীরের দলীল যদি গ্রহণযোগ্য হতো, রাসূলদের পাঠানো এবং তাদের উপর কিতাব নাযিল করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

৩) আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে অনেক বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন ও অনেক কাজ হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর সাধ্যাতীত কোনো কিছুই চাপিয়ে দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفسًا إِلَّا وُسعَهَا﴾

"তিনি কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না"। (সূরা আল বাকারা: ২৮৬)

অতএব বান্দা যদি তার কাজে বাধ্য হতো, তাহলে সে এমন কাজে আদিষ্ট হতো, যা থেকে তার পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। এটা সম্পূর্ণ বাতিল। অর্থাৎ তার প্রতি শরী'আতের আদেশ-নিষেধ অনর্থক হতো। অন্যায় কাজ করলে শাস্তি দেয়াও অন্যায় হতো। আল্লাহ তা'আলা অনর্থক কাজ করা ও যুলুম হতে পবিত্র।

৪) তাক্বদীরের বিষয়টি একটি লুকায়িত গোপন বিষয়। সংঘটিত হওয়ার আগে কোনো মানুষই এটা জানতে পারে না। বান্দা যখন কাজ করে, তখন কাজ করার আগেই ইচ্ছা করে। বান্দা যখন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে জানে না যে, এটাই আল্লাহর নির্ধারণ। অতএব, সে যদি কাজ করার পূর্বেই এটা দাবি করে যে, আল্লাহ আমার উপর এটা নির্ধারণ করেছেন, তা হবে সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা এটা ইলমুল গায়েব দাবি করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না। সুতরাং তার দাবি বাতিল। কারণ, বান্দা যা জানে না, তা দ্বারা দলীল পেশ করা অগ্রহণযোগ্য।

৫) যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাতে স্থায়ী ও চলমান থাকে এবং প্রতিবাদ করলে তাক্বদীরের দলীল পেশ করে, তাদের কথা মেনে নিলে শরী'আত অচল হয়ে যাবে।

৬) তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে যদি পাপ কাজ চালিয়ে যাওয়া বৈধ হয়, তাহলে ইবলীসের কথা মেনে নেয়া হতো। সে বলেছিল,

﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

"তুমি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলে এ কারণে আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব"। (সূরা আল আরাফ: ১৬)

এখানে ইবলীস তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করেছে। কিন্তু তার দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়নি; বরং তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে জাহান্নামের ধমক দেয়া হয়েছে।

৭) পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তাক্বদীর দ্বারা দলীল পেশ করলে যদি তা গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে আল্লাহর দুশমন ফেরাউন ও মূসা আলাইহিস সালাম উভয়ের মর্যাদা সমান হয়ে যেতো।

৮) পাপাচারের উপর তাক্বদীরের দলীল সঠিক হলে কাফেরদের কাজ-কর্মেরও বৈধতা প্রমাণিত হবে। কারণ, তারা শির্ক হতে তাওবা না করে তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করেছিল।

৯) তাক্বদীর দিয়ে দলীল দেয়া বৈধ হলে জাহান্নামীরাও তা দ্বারা দলীল দিতো। বিশেষ করে যখন তারা জাহান্নাম দেখবে ও ধারণা করবে যে, তারা তাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে। অনুরূপ যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তাদেরকে ধমক দেয়া শুরু হবে তখন কি তারা তাদের কুফরী ও পাপাচারের উপর তাক্বদীরের দলীল দাঁড় করাবে? কখনো নয়। বরং তারা স্বীকার করবে যে, এটা আমাদের পাপাচারেরই পরিণাম।

আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার রাসূলদের আহব্বানে সাড়া দিবো? (সূরা ইবরাহীম: ৪৪) তারা আরো বলবে, رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ "হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল। আর আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়"। (সূরা মুমিনূন: ১০৬) তারা আরো বলবে,

﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾

"আমরা যদি শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামীদের দলভুক্ত হতাম না"। (সূরা মূলক: ১০) তারা আরো বলবে, لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ "আমরা ছলাত আদায়কারী ছিলাম না"। (সূরা মুদ্দাছছির: ২০)

এমন আরো অনেক কথাই তারা বলবে। কিন্তু তারা এটা বলবে না যে, তাক্বদীরের লিখন আমাদেরকে জাহান্নামে আসতে বাধ্য করেছে। সকলেই নিজেদের ভুল স্বীকার করবে। তাক্বদীর দিয়ে দলীল দেয়া জায়েয হলে এবং সেটা কবুলযোগ্য হলে তারা এই ভয়াবহ সময় তাক্বদীরের দলীল দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতো। কেননা এ সময় তাদের এমন দলীলের খুব প্রয়োজন ছিল, যা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবে।

১০) তাক্বদীরের দলীল দিয়ে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অগ্রহণযোগ্য হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, আমরা দেখি যে, মানুষ দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার পথ ছেড়ে দিয়ে সে কষ্টের পথে আসতে চায় না। তাক্বদীরের দলীল দিয়ে কেউ কষ্টের পথে অগ্রসরও হয় না। দুনিয়াবী বিষয়ে কেন সে তাক্বদীরের দলীল দিয়ে সুখ-শান্তির পথ পরিহার করে কষ্টের পথে যায় না? তাক্বদীরের দলীল পেশ করে আখিরাতের কল্যাণের পথ বর্জন করে কেন?

বিষয়টি পরিষ্কার করে বলার জন্য আমি আপনাদের কাছে একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। মানুষ যখন কোনো দেশে ভ্রমণ করতে চায়, তখন ঐ শহরের যদি দু'টি রাস্তা থাকে, একটি নিরাপদ-আরামদায়ক এবং অন্যটি ভীতিকর-কষ্টকর তখন সে কোন রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়? কোনো সন্দেহ নেই যে, সে একাধিক রাস্তা থেকে সহজ ও নিরাপদ রাস্তাটি বাছাই করে নেয়। অতএব আখিরাতে জান্নাতের রাস্তা বাদ দিয়ে জাহান্নামের রাস্তা বেছে নিবে কেন?

১১) তাক্বদীরের এই দলীল পেশকারী যদি সন্তান লাভের আশায় বিবাহ করতে চায়, তাকে আমরা বলবো যে, আল্লাহ যদি তোমার ভাগ্যে সন্তান লিখে থাকেন, তাহলে সন্তান পাবে। আর না লিখে থাকলে পাবে না। সে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পানাহার করতে চাইলে আমরা বলবো, পানাহার করো না। আল্লাহ যদি তোমার ভাগ্যে পানাহার ছাড়াই পরিতৃপ্ত হওয়া লিখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তোমার ক্ষুধা-পিপাসা দূর হবে। অন্যথায় হবে না। হিংস্র জন্তু তোমার উপর আক্রমণ করতে চাইলে পালিয়ো না। কারণ, আল্লাহ যদি তোমার ভাগ্যে পরিত্রাণ লিখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তুমি পরিত্রাণ

পাবে। আর পরিত্রাণ না লিখে থাকলে পালিয়ে গিয়েও পরিত্রাণ পাবে না। অসুস্থ হলে ঔষধ সেবন করো না। আল্লাহ যদি আরোগ্য লিখে থাকেন, তাহলে তুমি অবশ্যই সুস্থ হবে; অন্যথায় হবে না।

সে কি আমাদের এসব কথায় রাজি হবে? সে যদি আমাদের কথায় সম্মতি দেয়, তাহলে তাকে পাগল সাব্যস্ত করবো। আর যদি সম্মতি না দেয়, তাহলে তার দলীলকে বাতিল সাব্যস্ত করবো।

১২) তাক্বদীরের এই বাতিল দলীলের স্বীকৃতি দেয়া হলে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, তাওবা করা, দু'আ করা, জিহাদ করা, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজের নিষেধ করা, নাবী-রাসূল প্রেরণ করা ইত্যাদি সবকিছুই বাতিল হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়।

১৩) তাক্বদীরের দলীল দিয়ে অন্যায় কাজের বৈধতা দেয়া হলে মানবজীবনের সমস্ত কল্যাণ নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে অরাজকতা বিরাজ করবে, শাস্তি দেয়া কিংবা ভয় দেখানোর কোনো প্রয়োজন হবে না। আইন-আদালত প্রতিষ্ঠা করা ও বিচারক নিয়োগ দেয়া, জেলখানা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদির স্বার্থকতা থাকবে না। কারণ, অপরাধী অচিরেই তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করবে। আর পৃথিবীর এই ব্যবস্থাপনা উঠিয়ে দেয়ার কথা পাগল ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে না।

১৪) তাক্বদীরের দলীল দিয়ে যেই অপরাধী পার পেতে চায় এবং বলে, আল্লাহ আমার উপর এই অপরাধ লিখে দিয়েছেন। অতএব, যেটা আল্লাহ আমার উপর লিখে দিয়েছেন, সেটার কারণে শাস্তি দেয়া হবে কেন?

তার জবাবে বলা হবে, পূর্বের লিখার কারণে তোমাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না; বরং তুমি যা করেছো, তার শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন ও লিখেছেন, সেই অনুযায়ী আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে যা আদেশ করেছেন, সেই অনুযায়ী আমাদের ফায়ছালা করা হবে; যা নির্ধারণ করেছেন সেই অনুযায়ী নয়। আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন ও লিখেছেন এবং আমাদেরকে যা কিছু আদেশ করেছেন, তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ যা কিছু আমাদের ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন ও লিখেছেন, তা আমাদের থেকে লাওহুল মাহফুযে গোপন রেখেছেন। আর যা কিছু আদেশ করেছেন, তা আমাদের জন্য প্রকাশ করেছেন এবং আমাদেরকে তা বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমাদেরকে লাওহুল মাহফুযে উঁকি দিয়ে দেখতে বলা হয়নি; বরং দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে বলা হয়েছে। এটা আমরা করতে সক্ষম। কিন্তু লাওহুল মাহফুযে উঁকি দিতে সক্ষম নই।

আসলে যেসব লোক তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে, তাদের অধিকাংশই তাদের দলীলের ব্যাপারে আস্থাশীল নয়। তারা কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণ ও হঠকারিতার কারণেই এই দলীল পেশ করে থাকে। তারা নিজেরাও জানে, তাদের যুক্তি ও দলীল যথার্থ নয়। এমনকি তাদের দলীলগুলো তারা নিজেরাও মেনে চলে না। তাদের কাজই তাদের যুক্তি খণ্ডন করে দেয়। অর্থাৎ তারা আখিরাতের বিষয়ে তাক্বদীরের দলীল দিয়ে আমল বর্জন করতে চায়; কিন্তু যেখানে পার্থিব স্বার্থ ও লাভ আছে, সেখানে তারা এই দলীল মানতে প্রস্তুত নয়।

তাক্বদীর দিয়ে কখন দলীল পেশ করা বৈধ?

মানুষের ভাগ্য কপালে যখন অনাকাঙ্খিত বিপদাপদ ও মুছীবত নেমে আসে, যেমন দারিদ্র, অসুস্থতা, স্বজন হারা হওয়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি, ফসল হানি, জান-মালের ক্ষতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাক্বদীরের দলীল পেশ করা যাবে। এতে ছ্ববর করা ও তাক্বদীরের নির্ধারণকে মন-মস্তিস্কে জাগ্রত করা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকারই প্রমাণ। অতএব মুছীবতে পড়ে তাক্বদীর দিয়ে দলীল দেয়া যাবে; পাপাচারে অগ্রসর হওয়ার সময় নয় এবং তাতে লিপ্ত হয়ে চলমান রাখার ক্ষেত্রেও নয়। পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যেই বনী আদম তাওবা করে, আল্লাহর কাছে তাওবা করে এবং ক্ষমা চায় ও মুছীবতে পড়ে ধৈর্য ধারণ করে, সেই সৌভাগ্যের হকদার হয়।

দুর্ভাগ্যবান সেই লোক, যে মুছীবতের সময় অস্থির হয় এবং তাক্বদীরের অযুহাত দেখিয়ে পাপাচার চালিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোনো লোক যদি অন্য কাউকে ভুলবশত হত্যা করে ফেলে, অতঃপর তাকে দোষারোপ করা হলে সে যদি তাক্বদীরের দলীল দেয়, তার দলীল দেয়া ঠিক আছে।

আর কেউ যদি অন্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, অতঃপর তাকে ধমক দেয়া হলে সে যদি তাক্বদীর দিয়ে দলীল দেয় তাহলে তার দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ কেউ আদম ও মূসার মাঝে সংঘটিত বিতর্কের হাদীছটি বুঝতে ভুল করে। তারা মনে করে আদম আলাইহিস সালাম তাঁর ভুলের জন্য তাক্বদীরের দলীল দিয়েছেন। হাদীছটি হচ্ছে,

احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

আদম (আলাইহিস সালাম) ও মূসা (আলাইহিস সালাম) পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হলো। মূসা আদমকে বলল, হে আদম! তুমিই আমাদেরকে তোমার পাপের কারণে জান্নাত থেকে বের করেছো। আদম মূসাকে বলল, তুমি মূসা, যাকে আল্লাহ তাঁর রেসালাত ও কালামের জন্য মনোনিত করেছেন। তারপরও কি তুমি আমাকে তাক্বদীরের এমন একটি বিষয়ে দোষারোপ করছো, যা আমার সৃষ্টির আগেই আমার উপর লিখা হয়েছে? এই বিতর্কে আদম মূসার উপর জয়লাভ করলো।[৪৬] আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর অপরাধের উপর তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করেনি। যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। আর মূসাও আদমকে পাপের কারণে দোষারোপ করেনি। কেননা মূসা (আলাইহিস সালাম) জানে যে, আদম (আলাইহিস সালাম) তাওবা করেছে এবং তাঁর রবের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। আল্লাহও ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাঁর তাওবা কবুল করেছেন এবং তাকে সরল পথ দেখিয়েছেন গুনাহ থেকে যে লোক তাওবা করে, তার কোনো গুনাহ থাকে না।

মূসা (আলাইহিস সালাম) যদি আদমকে পাপের কারণে দোষারোপ করতো, তাহলে আদম জবাব দিতো যে, তুমিও তো পাপ করেছো। একজন কিবতী লোককে তুমি হত্যা করেছো ও রাগান্বিত হয়ে তাওরাত নিক্ষেপ করেছো। মোটকথা মূসা (আলাইহিস সালাম) মুছীবতের উপর দলীল পেশ করেছে; পাপের উপর নয়। তাই আদম বিতর্কে মূসাকে পরাজিত করতে পেরেছে।

অতএব, যেসব বিপদাপদ ও মুছীবত তাক্বদীরের নির্ধারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে, সেগুলো মেনে নেয়া উচিত। কেননা এটাই প্রভু হিসেবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার মাধ্যম। আর পাপের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়; তবে যখন কারো দ্বারা পাপচার হয়ে যাবে, তখন ক্ষমা চাওয়া ও তাওবা করা জরুরী। সে তার পাপাচার থেকে তাওবা করবে এবং মুছীবতে ছ্বর করবে।

মুছীবতে পড়ে যেমন তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করা বৈধ, অনুরূপ পাপ কাজ হয়ে যাওয়ার পর তাওবাকারীর জন্যও তাক্বদীর দিয়ে দলীল দেয়া জায়েয আছে। পাপ যখন তাকে কষ্ট দিবে তখন সে তাক্বদীরের দলীল দ্বারা

---

[৪৬] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৪০৯।

নিজেকে সান্তনা দিবে। কেউ যদি তাওবা করার পরও তাকে দোষারোপ করে, তখন সে তাক্বদীরের দলীল পেশ করবে। কোনো তাওবাকারীকে যদি বলা হয়, তুমি এমন করলে কেন? তখন সে যদি বলে, এটা তো তাক্বদীরে ছিল, আমি তো তা থেকে তাওবা করেছি এবং ক্ষমা চেয়েছি। আল্লাহর নির্ধারণ ও ফায়ছালা অনুযায়ী এটা হয়েছে, তখন তার কথা মেনে নেয়া হবে। অতএব পাপ করার পর তাওবাকারীকে দোষারোপ করা বৈধ নয়। শেষ ভালো হওয়াটাই ধর্তব্য; শেষ ভালো হলে শুরুতে ত্রুটি থাকা মূল্যায়িত হবে না।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা إرادة দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

(১) ইরাদায়ে কাওনীয়া: এটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা। এটা এবং مشيئة সমার্থবোধক। এই শ্রেণির ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই হয় না। কাফের ও মুসলিম সবাই এই শ্রেণির ইচ্ছার অধীনে সমান। পাপাচার ও আনুগত্য সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এই শ্রেণির ইচ্ছার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾

আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়ছালা করেন তখন তা প্রতিহত হয় না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এমন জাতির কোন সাহায্যকারী থাকে না"। (সূরা রা'দ: ১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন। যাতে মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা করছে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন"। (সূরা আল আনআম: ১২৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾

"আমি যখন কোনো জনবসতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ[৪৭] দেই, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে। অতঃপর আযাবের ফায়ছালা সেই জনবসতির উপর বলবত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে দেই"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৬)

উপরের আয়াতগুলো যেই ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা উদ্দেশ্য। এই শ্রেণির ইচ্ছার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকা আবশ্যক নয়।

(২) ইরাদায়ে শারঈয়া: এ প্রকার ইরাদাহ হচ্ছে إرادة دينية شرعية ইরাদায়ে দীনীয়া শারঈয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শরী'আতগত ইচ্ছা। এই শ্রেণির ইচ্ছার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও পছন্দের বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকে। এই প্রকার ইচ্ছার মাধ্যমেই তিনি তাঁর বান্দাদের উপর শরী'আতের সকল হুকুম-আহকাম বিধিবদ্ধ করেছেন। এর উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী:

---

[৪৭] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে। (১) আয়াতে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতি, সৃষ্টি ও নির্ধারণগত নির্দেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রকৃতি ও নির্ধারণগত বিধান হিসাবে সবসময় এমনটিই হয়ে থাকে। যখন কোন জাতির ধ্বংস হবার সময় এসে যায়, তার বিত্তবানরা ফাসেক হয়ে যায়। আর ধ্বংস করার ইচ্ছা করা মানে এ নয় যে আল্লাহ বিনা কারণে কোন নিরপরাধ জনবসতি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, বরং এর মানে হচ্ছে, যখন কোন জনবসতি অসৎকাজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন এ সিদ্ধান্তের প্রকাশ এ পথেই হয়ে থাকে। সম্মানিত শাইখ এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

(২) এই আয়াত বা অনুরূপ আয়াত থেকে এটি বুঝার কোন সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সমৃদ্ধ ও বিত্তশালীদেরকে পাপ কাজের আদেশ দেন এবং তারা সেই আদেশেই পাপ কাজ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। যেমনটি মনে করে থাকে জাহেলের দলেরা; বরং অধিকাংশ আলেমের মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের যেই স্বাধীনতা দিয়েছেন, তারা তার অপব্যবহর করে এবং পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘনের ফলে তারা ধ্বংসের হকদার হয় বলেই আল্লাহ তাদেরকে পূর্বের নির্ধারণ ও ফায়ছালা অনুযায়ী ধ্বংস করেন; এমনটি নয় যে, আল্লাহর আদেশেই পাপ কাজ হয় এবং আল্লাহর হুকুমেই ধ্বংস হয়। কেননা কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল আনুগত্যের আদেশ করেন। তিনি অন্যায় ও অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না এবং অন্যায়, পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনকে পছন্দও করেন না।

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

"আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের উপর হাল্কা করার ইচ্ছা করেন। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে"। (সূরা আন নিসা: ২৭-২৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিতে, যাতে তোমরা শোকর গুজার হও"। (সূরা আল মায়িদা: ৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে"। (সূরা আল আহযাব: ৩৩)

ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শারঈয়ার মধ্যে পার্থক্য

উপরোক্ত উভয় শ্রেণির ইরাদার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলো একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে দেয়। এগুলো জানা না থাকলে কারো পক্ষে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে তাক্বদীরের মাসআলা বুঝাও সম্ভব নয়। নিম্নে আমরা পার্থক্যগুলো যথাসাধ্য সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করলাম।

(১) ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছার মাধ্যমে যা হয়, আল্লাহ কখনো তাকে ভালোবাসেন ও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আবার কখনো তাকে ভালোবাসেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না।

আর ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে যা সংঘটিত হয়, তাকে তিনি অবশ্যই ভালোবাসেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন। সুতরাং সকল প্রকার পাপকাজ

এবং অকল্যাণও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শামিল। সে হিসেবে সৃষ্টি ও নির্ধারণগত দিক থেকে তিনি পাপাচার সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু তিনি পাপ কাজকে ভালোবাসেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না। তিনি তাতে লিপ্ত হওয়ার আদেশও করেননি; বরং তা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অতএব, ইরাদা কাওনীয়া বা সৃষ্টিগত ইচ্ছা এবং মাশীআ একই জিনিস। আর ইরাদা শারঈয়া ভালোবাসার সমার্থক। অর্থাৎ আল্লাহর পছন্দ ও ভালোবাসা এবং ইরাদা শারঈয়া একই জিনিস।

(২) ইরাদায়ে কাওনীয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্য হয় না; বরং তা অন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইবলীস এবং সকল প্রকার পাপাচার ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে মুমিন বান্দাগণ নফ্সে আম্মারা ও শয়তানের সাথে সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থাকে। শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকায় নিপতিত হয়ে মানুষ পাপকাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও কাল বিলম্ব না করে আল্লাহর কাছে তারা তাওবা করে এবং ক্ষমা চায়। এমনি আরো ভালো উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন।[৪৮]

---

[৪৮] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শুধু ক্ষতি ও অকল্যাণের উদ্দেশ্যেই অকল্যাণ সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ হিকমত রয়েছে। আমরা কখনো তা থেকে কিছু বুঝতে পারি। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা অকল্যাণ সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর হিকমত বুঝতে পারি না।

বিষয়টি সহজভাবে বুঝানোর জন্য কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন কুরাইশ নেতা ও মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তি আবু তালিবের ঈমান না আনা এবং ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি ভোগ করার উদাহরণটি পেশ করা যেতে পারে। সম্ভবত তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হিকমতটি এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বাপ-দাদাদের দীনের উপর রেখেই তার দ্বারা তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজত করবেন এবং মুসলমানদের চরম বিপদের সময় এমন কল্যাণ সাধন করবেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে লিখা থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আবু তালেবকে তার পিতৃধর্মে লিপ্ত রেখে মুসলমানদের জন্য প্রচুর কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু সে যেহেতু তার ভাতিজার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, তাই আল্লাহ তা'আলার ন্যায় বিচারের কারণেই পরকালের নিয়ামত তার ভাগ্যে জুটবে না।

বিষয়টিকে আরো খোলাসা করে বুঝানোর জন্য খিযির আলাইহিস সালাম কর্তৃক মিসকীন লোকদের নৌকা ছিদ্র করে ফেলা ও একজন নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। এর পিছনে আল্লাহ তা'আলার কী হিকমত লুকায়িত ছিল- মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমে বুঝতে পারেননি বলেই তিনি খিযির আলাইহিস সালাম এর কাজের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। পরক্ষণেই খিযির আলাইহিস সালাম স্বীয় কর্ম-কাণ্ডের হিকমত খোলাসা করে বলে দিয়েছেন। মূলত শুধু শুধু ক্ষতির জন্যই আল্লাহ

ঐদিকে শারঈ ইচ্ছার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা মূলতই উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা শরী'আতগতভাবে ইচ্ছা

তা'আলার ইচ্ছায় কোন অন্যায় কর্ম সংঘটিত হয় না। আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজের পিছনেই কোন না কোন হিকমত ও কল্যাণ থাকে।

নৌকা ছিদ্র করা মিসকীন লোকদের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু তার মধ্যে যেই কল্যাণ রয়েছে, তা সেই ক্ষতির চেয়ে বহুগুণ উপকারী। কারণ ভালো নৌকাগুলো যালেম বাদশাহর লোকেরা ছিনিয়ে নেয়। ত্রুটিপূর্ণ নৌকার উপর তারা হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং নৌকা একেবারেই না থাকার চেয়ে ছিদ্র অবস্থায় তা থাকা তাদের জন্য কল্যাণকর।

খিযির আলাইহিস সালাম যেহেতু জানতে পারলেন ছেলেটি বড় হয়ে কাফের হবে এবং পিতামাতাকে কষ্ট দিবে, তাই হত্যা করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অন্যায় হলেও এই হত্যাকাণ্ডের পিছনেই রয়েছে ছেলেটির জন্য কল্যাণ এবং তার পিতামাতার জন্যও কল্যাণ। ছেলেটির জন্য এই বয়সে নিহত হওয়া এই দিক থেকে উপকারী যে, এখনো তার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়নি। সে নিহত হওয়ার পর জান্নাতে যাবে। অপর পক্ষে বড় হয়ে কুফরী ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে যাওয়া তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। ঐ দিকে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে পিতামাতাকে এমন সৎ সন্তান দান করবেন, যারা পিতামাতার প্রতি অনুগত থাকবে।

এমনি প্রচুর বৃষ্টি অনেক সময় কারো জন্য ক্ষতিকর হলেও তাতে আম মানুষের জন্য প্রচুর কল্যাণ থাকে। অনেক সময় বন্যায় কারো ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বাড়িঘর নষ্ট হওয়া অবশ্যই তাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এর মধ্যেও তাদের কল্যাণ থাকতে পারে। যেমন ধরুন ঝড়ে কোন গ্রামের কতিপয় লোকের বাড়িঘর ধ্বংস হলো আবার কারো বাড়িঘর অক্ষত রইল। যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো তারা মনক্ষুন্ন হলো। আর যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো না, তারা খুশি হলো। পরক্ষণেই যখন সরকারী ঘোষণা আসল, যাদের বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে রাজধানী ঢাকার উত্তরায় একটি বাড়ি দেয়া হবে, তখন যাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়নি, তারাও কামনা করল যে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হলেই ভালো হতো। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন কোন কাজ ক্ষতিকর দেখা গেলেও মূলত আল্লাহর নির্ধারিত প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।

আল্লাহ তা'আলা মদপানসহ অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে মানুষ মদপানে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। শুধু তাই নয় এই তাওবাও তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদতে পরিণত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মদ পান করে শুধু আল্লাহর নাফরমানী করা হোক এই জন্যই যে আল্লাহর ইচ্ছায় মদ সৃষ্টি হয়েছে, বিষয়টি এমন নয়; বরং সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরী হয় কিংবা ভুল করে মদ পান করা হলেও তা থেকে তাওবা করে মদ্যপায়ী আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে।

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা অযথা কোন কিছুই সৃষ্টি করেন না এবং তার কোন কর্মও হিকমত ছাড়া সংঘটিত হয় না, যা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারি না। তাই আমাদের সকল অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক।

করেছেন যে, বান্দারা তাঁর আনুগত্য করুক। কেননা তিনি আনুগত্যের কাজকে ভালোবাসেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

(৩) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও বিধানগত ইচ্ছা অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, সাথে সাথে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। যার মৃত্যু ঘটাতে চান, সাথে সাথে তার মৃত্যু হয় এবং যাকে রক্ষা করতে চান, কেউ তাকে মারতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। পবিত্র সেই সত্তা, যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"। (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২-৮৩)

আর শারঈ ইচ্ছার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা করেন, তা সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক নয়। কখনো তা বাস্তবায়িত হয়, আবার কখনো হয় না। ইরাদা শরঈয়া দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তার সবই বাস্তবায়ন হওয়া যদি আবশ্যক হতোই, তাহলে পৃথিবীতে কোনো অমুসলিম থাকতো না, সবাই ঈমান আনয়ন করে মুমিন হয়ে যেতো।

(৪) ইরাদা কাওনীয়ার সম্পর্ক তাওহীদুর রুবূবীয়ার সাথে। আর ইরাদা শারঈয়ার সম্পর্ক তাওহীদুল উলূহীয়ার সাথে।

(৫) যে ব্যক্তি ঈমান কবুল করে ও সৎ আমল সম্পন্ন করে, তার ক্ষেত্রে আল্লাহর উভয় ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ যে ব্যক্তি ছ্বলাত আদায় করে, সে আল্লাহর উভয় ইচ্ছাকে নিজের মধ্যে একত্রিত করেছে। কেননা ছ্বলাত আল্লাহর প্রিয় জিনিস। তিনি এর আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি এটাকে ভালোবেসেছেন ও পছন্দ করেছেন। এই দিক থেকে এটার সম্পর্ক শরী'আতগত ইচ্ছার সাথে। আর এটা যেহেতু বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ এটা বাস্তবায়িত হওয়া চেয়েছেন। এই দিক থেকে এটা ইরাদা কাওনীয়াও বটে। অতএব, আনুগত্যকারীর মধ্যে দু'টো ইরাদাই একত্রিত হয়।

আর যে ব্যক্তি কুফুরী করে ও পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়, তার মধ্যে শুধু আল্লাহর একটি ইচ্ছা পাওয়া যায়। আর সেটা হচ্ছে ইরাদা কাওনীয়া। এটা যেহেতু বাস্তবেই সংঘটিত হয়েছে, তাতে বুঝা গেলো, আল্লাহ চেয়েছেন যে,

এটা সৃষ্টি হোক ও বাস্তবায়িত হোক। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সৃষ্টিজগতে কিছুই হয় না। আর কুফুরী ও পাপাচারিতায় যেহেতু আল্লাহর ভালোবাসা ও পছন্দ মোটেই থাকে না, তাই এতে প্রমাণিত হয় যে, ইরাদা কাওনীয়াতেই পাপাচার ও কুফুরী সংঘটিত হয়। আল্লাহর আদেশ ও শরী'আতগত ইচ্ছায় নয়।

আর কাফেরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের যেই আদেশ দিয়েছেন এবং পাপাচারীকে সৎকাজের যেই আদেশ দিয়েছেন, তাতে শুধু ইরাদা শারঈয়া পাওয়া যায়। ঈমান ও সৎকাজ যেহেতু আল্লাহর কাছে প্রিয়, তাই এটার সম্পর্ক ইরাদা শারঈয়ার সাথে। আর এটা যেহেতু কাফের ও পাপাচারী থেকে বাস্তবায়িত হয়নি, যদিও তা বাস্তবায়ন করার আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন ও তা বাস্তবায়িত হওয়া পছন্দ করেছেন, তাতে বুঝা গেলো, কাফেরের ঈমানের সম্পর্কটা শুধু শরী'আতগত ইচ্ছার সাথে। কেননা এটা আল্লাহর কাছে প্রিয়; কিন্তু তা সংঘটিত হয়নি।

(৬)সম্পর্ক রাখার দিক থেকে ইরাদা কাওনীয়ার ক্ষেত্র বেশি প্রশস্ত। কেননা আল্লাহ তা'আলা যা ভালোবাসেন ও যা ভালোবাসেন না এবং যা পছন্দ করেন ও যা পছন্দ করেন না, এসবগুলোর সাথেই এর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন কুফরী ও পাপাচারের সাথেও এর সম্পর্কে রয়েছে। আর এটা অন্যদিক দিক থেকে সীমিত অর্থবোধক যে, তা কাফেরের ঈমান আনয়ন ও ফাসেকের আনুগত্যের সাথে সম্পর্ক রাখে না। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারা আদেশ বাস্তবায়ন না করার কারণে তাদের থেকে ঈমান ও আনুগত্য বাস্তবায়ন হয়নি।

আর ইরাদা শারঈয়া এই দিক থেকে অধিক ব্যাপক যে, এর সম্পর্ক প্রত্যেক আদেশের সাথে। যা বাস্তবায়ন হয়েছে, তার সাথে এবং যা বাস্তবায়িত হয়নি তার সাথেও। আর এটা এই দিক থেকে সীমিত অর্থবোধক যে, ইরাদা কাওনীয়া দ্বারা তাও বাস্তবায়ন হয়, যার আদেশ দেয়া হয়নি। যেমন আবু জাহেলের ঈমান। তাকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সে ঈমান আনেনি। তার দ্বারা ইরাদা শারঈয়ার বিপরীত জিনিস সংঘটিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে কুফুরী। তা সংঘটিত হয়েছে ইরাদা কাওনীয়ার দ্বারা।

যে ব্যক্তি এই দুই শ্রেণির ইরাদার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে, সে অনেক সন্দেহ থেকে বেঁচে যাবে। সে এমন অনেক বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে যাবে, যাতে অনেকের পদস্খলন ঘটেছে এবং অনেকেরই বুঝ শক্তি হারিয়েছে। সর্বশ্রেণির মানুষ থেকে যতসব কাজকর্ম প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে যে ব্যক্তি উপরোক্ত উভয় প্রকার ইচ্ছার চোখ দিয়ে দেখবে, সে

চক্ষুষ্মান বলে গণ্য হবে, আর যে ব্যক্তি মানুষের কাজগুলোকে কাদারের চোখ বাদ দিয়ে শুধু শরী'আতের চোখ কিংবা শরী'আতের চোখ বাদ দিয়ে শুধু কাদারের চোখ দিয়ে দেখবে, সে অন্ধ বলে বিবেচিত হবে।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়:

অনুগত একনিষ্ঠ মুমিন মুখলিছ বান্দার মধ্যে ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শারঈয়াহ উভয়টিই একত্রে বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ও নির্ধারণের দিক থেকে সৎকাজ সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহর যেই বান্দা সেই হুকুম কবুল করে নিয়েছে, তার মধ্যে আল্লাহর দু'টি ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে।

আর অপরাধীর অপরাধের মধ্যে শুধু ইরাদায়ে কাওনীয়াই বাস্তবায়ন হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের পথ বর্জন করে, তার দ্বারা অপরাধটি হয় শুধু এই হিসাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত অপরাধের স্রষ্টা;[৪৯] তাতে আদৌ আল্লাহর কোনো ধরনের আদেশ ও সন্তুষ্টি থাকে না।

আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয়:

যারা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত উভয় প্রকার ইরাদাহ সাব্যস্ত করেনি এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেনি, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। যেমন জাবরীয়া এবং কাদরীয়া (মুতাযেলা) সম্প্রদায়ের লোকেরা। জাবরীয়ারা শুধু আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া সাব্যস্ত করেছে। কাদরীয়ারা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে শারঈয়া সাব্যস্ত করেছে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উভয় প্রকার ইরাদাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও করেছেন।[৫০]

---

[৪৯] আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে ভালো বা মন্দের যে কোন একটি বেছে নেয়ার যে স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার সেই স্বাধীনতার অপব্যবহর করে বলেই তার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন; এ জন্য নয়। সেই সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বান্দার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। ফলে তিনি তা লিখিয়েছেন। তাই এ কথা বলার আদৌ কোনো অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা লিখিয়ে রেখেছেন বলেই বান্দা পাপ করে থাকে। আল্লাহ আগে থেকেই বান্দার সেই পাপ কাজের ব্যাপারে জানেন বিধায় বান্দা যে পাপ কাজ করতে বাধ্য, বিষয়টা এমন নয়।

[৫০] আল্লাহর ইচ্ছার ক্ষেত্রে জবরীয়া ও কাদারীয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ ভালোভাবে বুঝার জন্য আরেকটু খোলাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। জাবরীয়ারা বলে থাকে ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর একটিমাত্র ইচ্ছা তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয় এবং আল্লাহর

আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কিত মাসআলাটি আক্বীদাহর মাসআলাসমূহের অন্যতম একটি গুরুত্বপূণ বিষয় হওয়ার কারণে তা অধিকতর খোলাসা করার জন্য এ বিষয়ে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) এর বিশ্লেষণটি এখানে যোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তিনি বলেন, ইরাদাহ তথা আল্লাহর ইচ্ছা দুই প্রকার।

(১) ইরাদায়ে কাওনীয়া। এটি সম্পূর্ণরূপেই المشيئة-এর সমার্থবোধক। সেই হিসাবে أراد الله (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) এবং شاء الله (আল্লাহ চেয়েছেন) এই বাক্য দু'টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই প্রকার ইরাদার ব্যাপারে **প্রথম কথা** হচ্ছে, যেসব বিষয় ও কাজ আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না, তার সব ক্ষেত্রেই এই প্রকার ইরাদাহ বিদ্যমান থাকে।

শাইখ বলেন, এর উপর ভিত্তি করে আপনাকে যদি কেউ যখন প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কি কুফুরীর ইচ্ছা করেন? অন্য কথায় কুফুরীও কি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়? উত্তরে আপনি বলুন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলার ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছার অধীনে কুফুরীও সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যদি সৃষ্টিগতভাবে কুফুরী হওয়ার ইচ্ছা না করতেন, তাহলে কখনোই পৃথিবীতে কুফুরী হতো না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইরাদায়ে কাওনীয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যার ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই সংঘটিত হয়। অন্য কথায় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই হয় এবং তা না হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

বান্দাদের মধ্যে শুধু তাঁর এই একটি ইচ্ছারই বাস্তবায়ন হয়। এমনকি বান্দা তার কর্মে স্বাধীন নয়। তারা মনে করে এতে বান্দার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করা হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণ এবং বাস্তবতা তাদের এই মতবাদকে বাতিল প্রমাণিত করেছে।

আর কাদরীয়া তথা মুতাযেলাদের মতে আল্লাহর জন্য শুধু ইরাদায়ে শারঈয়া সাব্যস্ত। অর্থাৎ আল্লাহ শুধু তার বান্দাদেরকে ভালো কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। আর বান্দারা তাদের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্য কথায় তারাই তাদের কর্মের স্রষ্টা ও ইচ্ছা পোষণকারী। এমনকি বান্দার দ্বারা কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেনও না। (নাউযুবিল্লাহ) এটিও একটি বাতিল ও তাওহীদ বিরোধী কথা। কারণ (নাউযুবিল্লাহ) এতে একাধিক স্রষ্টা থাকা আবশ্যক হয়।

এ সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়ে কাদারীয়া ও জাবরীয়া সম্প্রদায়ের কথা ও তাদের কথার জবাব বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আমাদের অন্যতম অনুবাদগ্রন্থ শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া পড়ার অনুরোধ করা গেল। (আল্লাহই তাওফীক দাতা)

(২) দ্বিতীয় প্রকার ইরাদাহ হচ্ছে ইরাদায়ে শারঈয়া। এটি المحبة (ভালোবাসা) এর সমার্থক। এই প্রকার ইরাদায় أراد الله (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) অর্থ হলো, أحب الله আল্লাহ ভালোবেসেছেন ও পছন্দ করেছেন।

এই প্রকার ইরাদার ক্ষেত্রে **প্রথম কথা** হচ্ছে, এটি আল্লাহর ভালোবাসা ও পছন্দের সাথে খাছ। সুতরাং তিনি ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে কুফরী ও পাপাচার পছন্দ করেন না। আর **দ্বিতীয় কথা** হচ্ছে, তাতে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস হওয়া পছন্দ করেন, কিন্তু কখনো তা বাস্তবায়ন হয় আবার কখনো বাস্তবায়ন হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন যে, বান্দারা তাঁর ইবাদত করুক। কিন্তু জরুরী হিসেবে সকল সৃষ্টির পক্ষ হতে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয় না।[৫১] দেখা যাচ্ছে কিছু সংখ্যক মানুষ তার ইবাদত করে আর অন্যরা তাঁর ইবাদত করে না। কিন্তু ইরাদায়ে কাওনীয়া এর বিপরীত। সেখানে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হবেই হবে।

সুতরাং দুইদিক থেকে দুই প্রকার ইরাদার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

(১) ইরাদায়ে কাওনীয়ার মাধ্যমে যা ইচ্ছা করা হয়, তা সংঘটিত হওয়া অবধারিত। আর ইরাদায়ে শারঈয়ার মধ্যে তা আবশ্যক নয়।

(২) ইরাদায়ে শারঈয়া কেবল ঐ সব বস্তুর মধ্যেই সীমিত, যা হওয়া আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। আর ইরাদায়ে কাওনীয়া হচ্ছে ব্যাপক।

---

[৫১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইরাদায়ে শারঈয়ার দ্বারা যা হয়, তা আল্লাহর কাছে প্রিয় হলেও তা সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ও বাস্তবায়ন হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং যত আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা এই প্রকার ইরাদার সাথে খাছ। যেমন ছ্বলাত কায়েম করা, ছিয়াম রাখা, যাকাত প্রদান করাসহ ইত্যাদি আরো অনেক আমল করার আদেশ। এই কাজগুলো বাস্তবায়ন হওয়া আল্লাহর কাছে প্রিয়। সেই সাথে দৃষ্টি নত রাখা, চুরি-ডাকাতি না করা, যেনা-ব্যাভিচার ইত্যাদি আরো অনেক হারাম কাজ থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এ সব কাজ থেকে বান্দার বিরত থাকা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। কিন্তু কতক বান্দার দ্বারা আল্লাহ এই প্রকার ইরাদাহ বাস্তবায়িত হয়। আবার অনেকের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় না। না হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ সকল মানুষকে সৎকাজের উপর বাধ্য করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে বাধ্য করতে পারতেন, সেই ক্ষমতা তাঁর অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তা না করে পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে ভালো-মন্দের যে কোন একটি ইখতিয়ার করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। কুরআন, সুন্নাহর দলীল এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা মানুষের এই স্বাধীনতার বিষয়টি প্রমাণিত ও স্বীকৃত।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন আর যা পছন্দ করেন না, উভয়টিই এর মধ্যে শামিল।

এর উপর ভিত্তি করে এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কীভাবে এমন জিনিসের ইচ্ছা করেন, যা তিনি ভালোবাসেন না? অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা কীভাবে কুফরী, পাপাচার এবং সীমালঙ্ঘন হওয়ার ইচ্ছা করেন? অথচ তিনি তা পছন্দ করেন না।

এর উত্তর হচ্ছে অন্যায় ও ক্ষতিকর বস্তু সংঘটিত হওয়া একদিক থেকে আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং অন্যদিক বিচারে তা অপছন্দনীয়। এর মধ্যে যেই বিরাট কল্যাণ নিহিত থাকে, সেই দিক বিচারে এটি আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং এতে যেহেতু আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে, সেই হিসাবে এটি তাঁর কাছে অপ্রিয়।[৫২]

---

[৫২] আবু তালেবকে কুরাইশদের দীনে রাখা কোন্ দিক মূল্যায়নে আল্লাহর কাছে প্রিয় ছিল এবং খিযির আলাইহিস সালাম কর্তৃক নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করা ও মিসকীনদের নৌকা ভেঙে ফেলা কোন্ দিক বিবেচনায় আল্লাহর কাছে ভালো ছিল, তা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু বলা হচ্ছে যে, অনেক জিনিস মূলতই ঘৃণিত এবং অপছন্দনীয় হয়। কিন্তু তার দ্বারা আবার ভালো ফলাফলও অর্জিত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা কিছু নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত জিনিস নির্ধারণ করেন এবং তা সংঘটিত করেন। কিছু কিছু জিনিস প্রিয় হওয়া সত্ত্বে তা সংঘটিত করেন না। কেননা যেই নিকৃষ্ট জিনিসটি তিনি নির্ধারণ করেন, তার পথ ধরে অন্য এমন একটি প্রিয় জিনিস (ফলাফল) অর্জিত হয়, যা আল্লাহর কাছে ঐ প্রিয় বস্তু হতেও অধিক প্রিয় হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করার ইচ্ছা করেন এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান।" (সূরা আলে-ইমরান: ১৩৯-১৪১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা চান যে, মুমিনদের মধ্য হতে এমন কতিপয় মুমিন বিদ্যমান থাকুক, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তাঁর সন্তুষ্টির আশায় তাদের জীবন কুরবানী করবে এবং শহীদ হয়ে তাঁর নৈকট্য হাসিল করবে। এটি আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষের ঈমান আনয়ন করা থেকেও উত্তম। এই জন্যই তিনি নির্ধারণ করেছেন যে, পৃথিবীতে

সুতরাং একই জিনিস দুইদিক বিচারে একই সাথে প্রিয় এবং অপ্রিয় হওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ তার কলিজার টুকরা শিশু সন্তানকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। যাতে করে ডাক্তার শিশুর পেট ফেড়ে ভিতর থেকে দূষিত জিনিস বের করে ফেলে। অথচ অন্য কেউ তার শিশুর গায়ে সুইয়ের একটি খোঁচা দিতে চাইলেও সে রাজী হয় না' বরং সে তার সাথে ঝগড়া করে।

অপরপক্ষে সে নিজেই পেট ফেড়ে ফেলার জন্য শিশুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার শিশুর পেট কাটে ও চিরে ফেলে। পিতা এই দৃশ্য খুশি মনেই দেখে। এতে তার শিশুর কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কী কারণে সে রাজী হয়? রাজী হওয়ার কারণ হলো, এই মূহুর্তে শিশুর কষ্ট হলেও অন্য কারণে অর্থাৎ

কাফের থাকুক, কুফুরী থাকুক এবং কাফেরদের মাঝে ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকুক। যাতে করে তার বান্দাদের মধ্য হতে কতিপয়কে শহীদ হিসাবে গ্রহণকরতে পারেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যদি গুনাহ না করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন এবং তোমাদের বদলে অন্য এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে। অতঃপর তারা তাওবা করবে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। (ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৭৪৯)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন যে, বান্দারা পাপ কাজ করবে এবং তা করার পর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করার মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকবে। অপরাধ হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করা আল্লাহর কাছে একাধারে আনুগত্যের উপর বিদ্যমান থাকার চেয়ে অধিক প্রিয়। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য পাপকাজ নির্ধারণ করেছেন। ঠিক তেমনি বান্দার দ্বারা পাপ হওয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার الغفور গাফুর (ক্ষমাকারী), الرحيم (দয়াকারী) ইত্যাদি অতি সুন্দর নাম ও সুমহান ছিফাতের প্রভাব প্রকাশিত হয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় বিষয় তথা পাপ কাজ থাকার কারণেই আল্লাহর অনেক সুমহান গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই দেখা গেল আল্লাহ তা'আলা যেসব অকল্যাণ সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে হিকমতে ইলাহী হচ্ছে, তাতে অন্যান্য প্রিয় ফলাফল অর্জিত হয়। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক। বলাবহুল্য যে, পূর্বোক্ত হাদীছে আল্লাহ পাক আদৌ পাপের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন না; বরং পাপ হয়ে গেলে যাতে বান্দা নিরাশ হয়ে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত না হয়, তা বলা উদ্দেশ্য। তাই তো মূলনীতি হচ্ছে, পাপ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর ভয়কে প্রাধান্য দেয়া, যাতে পাপ না সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে শত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাপ যদি হয়েই যায়, তাহলে এহেন মুহূর্তে আশাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যাতে ক্ষমা চাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে না যায়।

শিশুর জন্য এমন এক বিরাট স্বার্থ ও কল্যাণ হাসিলের আশায় সে একটি অপছন্দনীয় বিষয় পছন্দ করে, যা ভবিষ্যতে অর্জিত হবে।

তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু সংশয় ও তার নিরসন

১। প্রথম সন্দেহ ও তার জবাবঃ আল্লাহর প্রতি মন্দের সম্বন্ধ করা যাবে কি? কেউ যদি প্রশ্ন করে, আমরা তাক্বদীরের ভালো-মন্দ সবকিছুর উপর বিশ্বাস করি। আরো বিশ্বাস করি যে, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে সংঘটিত হয়। তবে মন্দের সম্বন্ধ কি আল্লাহর প্রতি করা যাবে? আল্লাহর কাজের মধ্যে কি কোনো মন্দ আছে?

এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে, আল্লাহ মন্দ কাজ করা থেকে পবিত্র। তিনি ভালো ছাড়া অন্য কিছু করেন না। মন্দটাকে তাক্বদীর বা নির্ধারণ করা ও সৃষ্টি করার দিক থেকে মূল্যায়ন করলে তা সৃষ্টি করা ও নির্ধারণ করা দোষণীয় হয় না। তাক্বদীর বলতে আল্লাহর ইলম, লিখা, ইচ্ছা ও সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য। এগুলো আল্লাহর অতি উত্তম গুণাবলী। এগুলোর মধ্যে শুধু কল্যাণই আছে। তাতে পূর্ণতা ছাড়া আর কিছু নেই। অতএব অকল্যাণের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা যাবে না। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও তাঁর কাজের মধ্যে কোনো অকল্যাণ নেই। আল্লাহর কাজের মধ্যে যদি মন্দ কিছু থাকতো, তাহলে الشر (মন্দ) থেকে তাঁর জন্য একটি নাম গ্রহণ করা হতো। কিন্তু আল্লাহর সব নামই অতি সুন্দর। আল্লাহর কাজের মধ্যে الشر (মন্দ) থাকলে আল্লাহর নামগুলো অতিসুন্দর হতো না।

তবে আল্লাহর কিছু কিছু মাখলুকের (সৃষ্টির) মধ্যে মন্দ আছে। অর্থাৎ সৃষ্টিকৃত কিছু কিছু বস্তুর মধ্যে মন্দ আছে, কিন্তু আল্লাহর নির্ধারণ করা ও সৃষ্টি করার মধ্যে কোনো অকল্যাণ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি করা গুণের মধ্যে কোনো মন্দ নেই। কারো ক্ষতি করার জন্য তিনি কিছুই সৃষ্টি করেন না। তবে তার কিছু কিছু সৃষ্টির মধ্যে ক্ষতি আছে। কিন্তু এই মন্দ সৃষ্টিটাও সকল দিক থেকে মন্দ নয়। একই জিনিস এক স্থানে মন্দ হয়, কিন্তু অন্যস্থানে সেই জিনিস ভালো হয়। একই জিনিস একস্থানে থাকলে এক দিক থেকে মন্দ হয় আবার অন্যদিক থেকে সেই জিনিস ভালো হয়। যেমন মৃত্যুদণ্ড কায়েম করা, দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যাদের উপর এগুলো কায়েম করা হয়, তাদের জন্য এটা অমঙ্গল হয়। তাও আবার সকল দিক থেকে নয়। এক দিক থেকে মন্দ এবং অন্যদিক থেকে মন্দ নয়। মৃত্যুদণ্ড কায়েম করা ও দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার মধ্যে কারো

জন্য অমঙ্গল থাকলেও অন্যদের জন্য প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। এতে অন্যরা সাবধান হয় এবং যাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়, তারা অন্যান্য অপরাধীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়। অনুরূপ রোগ-ব্যাধি একদিক থেকে মন্দ হলেও বহুদিক থেকে ভালো।

মোট কথা মন্দের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা যাবে না। ছ্বহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

"আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ঐ সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার ছ্বলাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ! তুমি এমন বাদশাহ যিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তুমি আমার প্রভু। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও। তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করো। তুমি ব্যতীত আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি আমার থেকে খারাপ চরিত্রগুলো দূর করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার থেকে খারাপ চরিত্রগুলো দূর করতে সক্ষম নয়। হে আমার প্রভু! আমি তোমার হুকুম পালন করতে প্রস্তুত ও উপস্থিত আছি। আমি তোমার আনুগত্যের জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার উভয় হস্তেই নিহিত। অকল্যাণকে তোমার দিকে সম্বোধিত করা শোভনীয় নয়। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার দিকে মুখাপেক্ষী ও নিজেকে তোমার উপর সোপর্দকারী এবং তোমার দিকেই আমি প্রত্যাবর্তনকারী। তুমি বরকমতময় ও মহিমান্বিত। তোমার কাছেই আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটই তাওবা

করছি।[৫৩] আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে এ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ছ্বলাত শুরু করার সময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আ পাঠ করতেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছের উপর টিকা লাগাতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ পবিত্র মন্দের নিসবত থেকে। অর্থাৎ মন্দের সম্বন্ধ তাঁর প্রতি করা অশোভনীয়। যা কিছুর সম্বন্ধ আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে, তার সবই ভালো। সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ভালো-মন্দ যা কিছু আছে সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মন্দের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা শোভনীয় নয়। এই কথার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা মন্দও সৃষ্টি করেছেন। অতএব আল্লাহর কিছু কিছু সৃষ্টির মধ্যে মন্দ রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি করা কাজ ও ছিফাতের মধ্যে নয়। মন্দ সৃষ্টি করাটা দোষণীয় নয়। কারণ আল্লাহ মন্দের জন্য মন্দ সৃষ্টি করেননি। মন্দ সৃষ্টি করা কাজটা ভালো ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ, এতে বিরাট হিকমত রয়েছে। আমরা তা জানি আর নাই জানি। মন্দ সৃষ্টি করা কাজটা দোষণীয় নয়; যদিও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কিছু কিছু দোষণীয় সৃষ্টি আছে। যেমন সর্বপ্রকার মন্দের নায়ক হলো ইবলীস। ইবলীস খুবই মন্দ ও নিন্দিত। কিন্তু ইবলীস সৃষ্টি করা মন্দ ও দোষণীয় নয়। কারণ, ইবলীস সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিরাট কল্যাণ অর্জিত হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা না হলে মানুষের দ্বারা পাপকাজ হতো না। পাপ কাজ না হলে তাওবা হতো না। আর তাওবা না হলে আল্লাহ তা'আলার غفار-غفور-عفو (ক্ষমাকারী, ক্ষমাশীল) এসব নামের প্রভাব সৃষ্টির উপর পড়তো না। আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর এ নামগুলো অর্থহীন হয়ে যেতো। অতএব ইবলীস সৃষ্টি করা মন্দ হয়নি; ভালোই হয়েছে। যদিও তার দ্বারা কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু অন্যরা লাভবান হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, সৃষ্টির মধ্যে যেসব ক্ষতিকর সৃষ্টি আছে, তা সবদিক বিবেচনায় ক্ষতিকর নয়।

উদাহরণ স্বরূপ প্রচুর বৃষ্টিপাতের কথা বলা যেতে পারে। তা কারো জন্য ক্ষতিকর হলেও এর মধ্যে অনেকের উপকার রয়েছে। কারো ফসল নষ্ট হলেও অন্যদের ফসলের উন্নতি হয়। এতএব বৃষ্টির মধ্যে ক্ষতি থাকলেও বৃষ্টি বর্ষণ করা কাজটা মন্দ নয়। অপারেশনের ডাক্তার রোগীর পেট কাটলেও কোনো রোগী ডাক্তারকে গালি দেয় না। বরং ডাক্তারকে সম্মান করে এবং অর্থ-সম্পদ প্রদান করে। কারণ, রোগী জানে যে, পেট কাটা তার জন্য প্রথমত কষ্টকর হলেও পরিণামের দিক থেকে ভালো। তিতা ঔষধ সেবন করা রোগীর জন্য কষ্টকর হলেও ভালো হওয়ার আশায় রোগী তা সেবন

---

[৫৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৭৭১, অধ্যায়: রাতের ছ্বলাতের দু'আ।

করে। অতএব ইবলীস আল্লাহর কাছে মন্দ হলেও ভালো উদ্দেশ্যে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। রোগ-ব্যাধি রোগীর জন্য পীড়াদায়ক হলেও সব দিক বিবেচনায় তা রোগীর জন্য ক্ষতিকর নয়। রোগী যদি ছ্বর করে তাহলে এটা তার জন্য কষ্টকর হলেও পরিণামের দিক থেকে ভালো। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করেন, মর্যাদা বাড়ান। অতএব মন্দের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা যায় না, এর অর্থ হলো আল্লাহর কাজের মধ্যে কোনো মন্দ নেই। আর আল্লাহর কাজের মধ্যে মন্দ নেই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মন্দ আছে, এই উভয় কথার মধ্যে পার্থক্য বুঝা আবশ্যক।

অতএব আল্লাহ সৃষ্টি করেন, কাজ করেন, ফায়ছালা করেন ও নির্ধারণ করেন। এগুলোর প্রত্যেকটাতেই রয়েছে মঙ্গল। আল্লাহ যুলুম থেকে পবিত্র। বস্তুকে তার আসল স্থানে না রেখে অন্যস্থানে রাখার নামই যুলুম। আল্লাহ কোনো জিনিসকেই তার উপযুক্ত স্থান বাদ দিয়ে অন্যস্থানে রাখেন না। বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখার মধ্যে রয়েছে মঙ্গল। বস্তুর আসল স্থান বাদ দিয়ে অন্যস্থানে রাখাই যুলুম। অতএব অমঙ্গলের জায়গাতে অমঙ্গল স্থাপন করলে সেটা অমঙ্গল হয় না। যেমন চোরের হাত কাটলে চোরের জন্য অমঙ্গল হলেও অন্যান্য দিক বিবেচনায় হাত কাটা অমঙ্গল নয়। যেনাকারীর উপর শাস্তির বিধান কায়েম করা হলে যেনাকারী কষ্ট পেলেও এর শাস্তি নির্ধারণ করার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক কল্যাণ। এতে রয়েছে মানুষের মান-ইজ্জতের হোফাযত। অতএব জানা গেলো যে, অমঙ্গলের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হয় না। অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারণ ও সৃষ্টি করার মধ্যে অমঙ্গল বলতে কিছু নেই। আল্লাহর অতি সুন্দর নামগুলোই এর সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহর নির্ধারণের মধ্যে অমঙ্গল কিছু থাকলে এই অর্থে তাঁর কোনো না কোনো নাম থাকতো। এরকম কোনো নাম যেহেতু আমরা পাচ্ছি না, তাই বুঝা গেলো তার কাজের মধ্যে কোনো অমঙ্গল নেই। কারণ, আল্লাহর কাজগুলো তাঁর নাম অনুপাতেই হয়ে থাকে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আল্লাহর অতি সুন্দর নামগুলো তাঁর প্রতি মন্দ, নিকৃষ্ট ও যুলুমের সম্বন্ধ করার প্রতিবন্ধক। অথচ আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি বান্দার স্রষ্টা, বান্দার কথা, কাজ, নড়াচড়া ও স্থির থাকারও স্রষ্টা। বান্দা যখন নিষিদ্ধ নিকৃষ্ট কাজ করে, তখন বলা হয়, সে মন্দ কাজ করেছে। আর আল্লাহই তাকে মন্দকাজ সম্পন্নকারী বানিয়েছেন। অর্থাৎ এটা করার ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন। মন্দকাজ সম্পন্নকারী বানানোটা ন্যায়, হিকমতপূর্ণ এবং সঠিক হয়েছে। সুতরাং তাঁকে কাজ সম্পন্নকারী বানানোটা ভালো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই করা হয়েছে। বান্দা কর্তৃক বাস্তবায়িত মন্দ কাজটি মন্দ ও নিকৃষ্ট। বান্দাকে কাজ সম্পন্নকারী বানানো

প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানের রাখার নীতি অনুসারেই হয়েছে। কেননা এতে আল্লাহর পরিপূর্ণ হিকমত রয়েছে, যে কারণে তিনি প্রশংসিত হন। অতএব অমঙ্গল সৃষ্টি করাও মঙ্গল, হিকমত ও কল্যাণকর। যদিও এটা বান্দার পক্ষ হতে বাস্তবায়ন হওয়া দোষণীয়, ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষতিকর। ঈষৎ পরিবর্তন ও ব্যাখ্যাসহ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের কথা এখানেই শেষ।[৫৪]

অতএব মন্দের সম্বন্ধ আল্লাহর প্রতি করা যায় না। তিনি মন্দ সৃষ্টি করেন ঠিকই; কিন্তু সৃষ্টি করাটা মন্দ নয়। কেননা মন্দ তখনই মন্দ হয়, যখন তাকে তার প্রকৃত স্থান বাদ দিয়ে অন্যস্থানে রাখা হয়। আর এটাই যুলুম। তার বিপরীত হচ্ছে আদল বা ন্যায়। আল্লাহ আদলের গুণে গুনান্বিত। যুলুম থেকে পবিত্র। চোরকে বাদ দিয়ে যখন ভালো মানুষকে পেটানো হয়, তখন এই পেটানো যুলুম হয়। কারণ, পেটানোর স্থান ভালো মানুষের শরীর নয়। চোরকে পেটানো ন্যায়সঙ্গত। এই জন্যই শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদাহ করা সবচেয়ে বড় অন্যায়। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সিজদাহ পাওয়ার হকদার নয়। সুতরাং সিজদাটা যখন কোনো মাজার ও কবরে প্রদান করা হবে, তখন এটা হবে চরম যুলুম। আর যখন এটা আল্লাহর জন্য কোনো মসজিদে হবে তখন এটা হবে ন্যায় ও যথার্থ।

অমঙ্গল দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় মানুষকে তার অপরাধের কারণে কষ্ট ও শাস্তি দেয়া, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক এই শাস্তি সৃষ্টি করা কোনোভাবেই মন্দ নয়। বরং এটাই তাঁর পরিপূর্ণ আদল বা ন্যায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাদেরকে এমন আদেশ দিয়েছেন, যা তাদের জন্য উপকারী এবং এমন জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন, যা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে আনুগত্যের আদেশ দেয়ার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। আবার সেই আনুগত্যের কাজে বান্দাদেরকে সাহায্য করে আরেকটি অনুগ্রহ করেন।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোনো একজন ন্যায়পরায়ণ আলেম মানুষকে উপকারী কাজের আদেশ দিলেন। অতঃপর কিছু মানুষকে তিনি তার আদেশ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করলেন। কিন্তু অন্যদেরকে সাহায্য করলেন না। এ ক্ষেত্রে যাদেরকে তিনি সাহায্য করলেন, তাদের প্রতি তিনি পরিপূর্ণ অনুগ্রহকারী হিসেবে গণ্য হলেন। আর যাদেরকে তিনি সাহায্য করেননি, তাদের প্রতি তিনি যুলুমকারী হবেন না। আর যখন ধরে নেয়া হবে যে, তিনি

---

[৫৪] শিফউল আলীল, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৬।

অপরাধীকে তাঁর আদল ও হিকমতের দাবি অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছেন, তাহলেও তিনি উভয় ক্ষেত্রেই প্রশংসিত হবেন। প্রথম শ্রেণির মানুষ দ্বারা প্রশংসিত হবেন কল্যাণকর কাজের আদেশ দেয়া ও তা বাস্তবায়নে সাহায্য করার কারণে। আর দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ দ্বারা প্রশংসিত হবেন এই জন্য যে, তিনি নিজে নিজেই তাদের কল্যাণার্থে তাদেরকে উপকারী আদেশ দিয়েছেন। যেটা তার উপর মোটেই ওয়াজিব ছিল না।

সর্বাধিক প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলার হিকমত এবং প্রজ্ঞা ও দয়া বুঝার কেউ আছে কী? তিনি তাঁর আদেশগুলোর মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেছেন, শিক্ষাদান করেছেন ও কল্যাণকর বিষয়গুলো জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি যদি তার আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করেন, তাহলে তিনি আদিষ্ট বান্দার উপর তার নিয়ামতের পূর্ণতা দানকারী হবেন। এ অবস্থায় তিনি দুই কারণে বান্দার কৃতজ্ঞতা পাবেন। পথপ্রদর্শন করার কারণে ও কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করার কারণে। আর তিনি যদি বান্দাকে সৎপথে চলতে সাহায্য না করার কারণে এবং পরিত্যাগ করার কারণে বান্দা পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে এর মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর কোনো না কোনো হিকমত থাকে।

অতঃপর বান্দার উপর করণীয় হচ্ছে, যখন সে তার জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর জিনিসগুলো জানতে পারবে, তখন মহান আল্লাহর সামনে নত হবে, যাতে তিনি তাকে উপকারী কাজ করতে সাহায্য করেন। সে যেন এটা না বলে যে, আমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা উপকারী আমল সৃষ্টি না করা পর্যন্ত কোনো আমল করবো না। যেমন হিংস্র জন্তু কিংবা শত্রু আক্রমণ করলে দৌড়িয়ে পালায়। সে এ কথা বলে না, আমি পালাবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার মধ্যে পলায়ন করা কাজটা সৃষ্টি করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মহান আল্লাহর প্রতি অমঙ্গলের সম্বন্ধ করা অশোভনীয়।

২। দ্বিতীয় সন্দেহ ও তার জবাব: আল্লাহ কেন এমন বিষয়ের ইচ্ছা করেন, যা তিনি পছন্দ করেন না?

যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ কেন এমন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, যা তিনি নিজেই ভালোবাসেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট ও রাজি থাকেন না? কীভাবে তিনি একটা জিনিসের ইচ্ছা করেন ও তাকে অপছন্দ করেন ও ঘৃণা করেন?

এই সন্দেহের জবাবে আমরা বলবো যে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন এবং যা সৃষ্টি করেন তা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণি হচ্ছে, যা মূলগত কারণেই সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে, যা অন্য

কারণে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন; মূলগত কারণে নয়। মূলগত কারণে যা সৃষ্টি করেন, তা আল্লাহর কাছে মূলগত কারণেই প্রিয় এবং তাতে যে কল্যাণ রয়েছে তাও আল্লাহর কাছে প্রিয়। আর এটা সৃষ্টি করা মূলগত কারণেই উদ্দেশ্য হয়। যেমন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা ও তাঁকে সৃষ্টি করা। তিনি মূলগত কারণেই আল্লাহর কাছে প্রিয়। তার মধ্যে যেসব পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য ও সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে, তাও আল্লাহর কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা মূলগত কারণে নয়; বরং অন্য কারণে যা সৃষ্টি করেন, তা সৃষ্টি করা মূলগত দিক থেকে উদ্দেশ্য হয় না। তার মূলে ও ভিতরে দৃষ্টি দিলে কোনো কল্যাণও চোখে পড়ে না। কিন্তু তা আল্লাহর ভালো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম হয়। অতএব সেটা মূলগত দিক থেকে আল্লাহর কাছে অপ্রিয়; কিন্তু ভালো উদ্দেশ্যে পৌঁছার দিক থেকে সেটা প্রিয়। অর্থাৎ তার মাধ্যমে যেটা হাসিল হয়, সেটা আল্লাহর কাছে প্রিয়। যেমন ইবলীস মূলগত দিক থেকেই আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। তার ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে দৃষ্টি দিলে তাতে কোনো কল্যাণও লক্ষ্য করা যায় না। তারপরও আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন। তাকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও কেন সৃষ্টি করলেন? উত্তর হচ্ছে তাকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও ভালো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যই তাকে সৃষ্টি করেছেন। যেটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। যেমন বান্দার তাওবা। আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। আর এটা ইবলীস সৃষ্টি করার কারণেই বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্যান্য পাপাচার ও মন্দ কাজগুলো সৃষ্টি করার ব্যাপারেও একই কথা। অতএব একই জিনিসকে অপছন্দ করা ও তার ইচ্ছা করা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। একই জিনিসকে তিনি একদিক থেকে ঘৃণা করেন এবং অন্যদিক থেকে পছন্দ করেন। আমরা মূলগত কারণে তিতা ঔষধ সেবন করার ইচ্ছা করি না; কিন্তু অন্য কারণে তা পান করার ইচ্ছা করি। সেটা হচ্ছে আরোগ্য লাভ করা। রোগীর কাছে আরোগ্য লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছু হতে পারে না।

মানব সমাজেও এটা একটা জ্ঞাত বিষয়। আপনি জানেন যে, কিছু কিছু ঔষধ খুব তিতা, এর গন্ধও অসহনীয়। রোগী যখন জানতে পারে যে, তাতে তার শিফা রয়েছে, তখন সেটাকে অপছন্দ করে তিতা লাগা ও দুর্গন্ধের কারণে, কিন্তু সেটাকে পছন্দ করে অন্য কারণে। আর তা হচ্ছে যেমন তিতা ঔষধ সেবন করে সে আরোগ্য লাভ করতে পারবে। অতএব ভালো ফলাফল অর্জিত হবে বলেই সে তিতা ঔষধ অপছন্দ সত্ত্বেও পান করে। অনুরূপ যখন আমরা জানতে পারি যে, শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে ফেলার মধ্যেই শরীরের বাকী অঙ্গগুলোর নিরাপত্তা রয়েছে, তখন সে অঙ্গটা কেটে ফেলাটার ইচ্ছা করি। যদিও শরীর থেকে একটি অঙ্গ ফেলে দেয়া খুবই পীড়া ও

বেদনাদায়ক। কিন্তু ভালো ফল লাভের আশায় আমরা এই তিক্ততর কাজটা করে ফেলি। যখন জানতে পারি দুর্গম গীরিপথ অতিক্রম করার পর ভালো ফলাফল লাভ হবে, তখন বহু কষ্ট করে হলেও তা আমরা অতিক্রম করি। প্রচুর ছাওয়াব অর্জন ও গুনাহ মাফের বুক ভরা আশা নিয়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে কা'বা ঘরে পৌঁছে যাই।

এতে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, একই জিনিসের মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি দিক একত্রিত হতে পারে। আমরা একদিক থেকে একটি জিনিসকে ঘৃণা করতে পারি আবার অন্যদিক থেকে সেটাকে ভালোবাসতে পারি। আমরা মাখলুক হিসেবে যদি এটা করতে পারি, তাহলে খালেকের জন্য এটা করা শোভনীয় হবে না কেন? তিনি কোনো জিনিসকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও অন্যের কারণে তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন। এটা দোষণীয় নয়; বরং তা পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও হিকমতের দাবিতেই করে থাকেন। সেটা প্রিয় বস্তু হাসিলের মাধ্যম হওয়ার কারণেই করে থাকেন।

ইবলীস সৃষ্টির কারণ ও হিকমত

উদাহরণ স্বরূপ আমরা ইতিপূর্বে ইবলীসের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। সে হচ্ছে পৃথিবীতে প্রত্যেক ফাসাদের উস্কানি দাতা। দীনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, আক্বীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও সন্দেহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে-ই দায়ী। সে-ই মানুষের দুর্ভাগ্যের কারণ। সে মানুষকে এমন আমল করায়, যাতে আল্লাহ রাগান্বিত হন। এত কিছুর পরও সে অনেক প্রিয় বস্তু অর্জনের মাধ্যম ও অনেক হিকমত তার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। এসব হিকমত সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করা আবশ্যক। তা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাজগুলোর সাথে হিকমত জড়িয়ে দেয় এবং তার উপকারিতা সাব্যস্ত করে তার উপর আল্লাহর প্রত্যেক কাজ ও আদেশের কারণ জানা জরুরী নয়। বরং তার এতটুকু বিশ্বাস করাই যথেষ্ট যে, আল্লাহর প্রত্যেক কাজেই বিরাট হিকমত রয়েছে। এই হিকমত আমাদের জন্য প্রকাশিত হোক বা না হোক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সব কাজের হিকমত সৃষ্টিকে জানাননি। বরং তিনি যা জানানোর ইচ্ছা করেছেন, তাই জানিয়েছেন। যা জানিয়েছেন, তার চেয়ে আরো বেশি গোপন রেখেছেন। অতএব মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর কাজ ও আদেশগুলো বিরাট হিকমত থেকে মুক্ত নয়, যা বিবেক-বুদ্ধিকে হয়রান করে দেয়। যদিও বান্দা সেগুলোকে বিস্তারিতভাবে জানে না।

এবার আসুন জেনে নেই ইবলীস সৃষ্টি করার পিছনে মহান আল্লাহর কী কী হিকমত রয়েছে। এগুলো জানার মধ্যে ঐ ব্যক্তির উপকার রয়েছে, যে বারবার প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কেন ইবলীস সৃষ্টি করলেন? এগুলোকে সৃষ্টি না করেও তো তিনি তাঁর ভালো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারতেন। কেনই বা ইবলীসকে সৃষ্টি করে আমাকে বিপদে ফেললেন?

(১) সৃষ্টির সামনে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি জিনিস সৃষ্টি করে আল্লাহর কুদরত প্রকাশ করা:

সৃষ্টির সামনে যাতে তাঁর সুমহান কুদরত প্রকাশ হয়, এই জন্যই তিনি উৎকৃষ্ট জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং এর বিপরীতে নিকৃষ্ট জিনিসও সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং শত্রুকেও সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি ইবলীস সৃষ্টি করেছেন। যে কিনা সব অমঙ্গলের কারণ। তার মোকাবেলায় সর্বাধিক উৎকৃষ্ট ও পবিত্র সৃষ্টি জিবরীলকে সৃষ্টি করেছন। জিবরীল সমস্ত মঙ্গলের কারণ। সুতরাং জিবরীল সৃষ্টি করার মাধ্যমে যেমন তাঁর বড়ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি ইবলীল সৃষ্টির মাধ্যমেও তাঁর মহত্ব প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপ দিন-রাত, গরম-ঠাণ্ডা, আগুন-পানি, রোগ-প্রতিষেধক, জীবন-মরণ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট পরস্পর বিপরীতমুখী ইত্যাদি জিনিস সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত প্রকাশ হয়েছে। বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে ঐ জিনিসের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। বিপরীতমুখী এসব জিনিস সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা, শক্তি, সার্বভৌমত্ব ও রাজত্ব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একটির বিপরীতে অন্যটি সৃষ্টি করেছেন এবং একটিকে অন্যটির উপর শক্তিশালী করেছেন। আর এগুলোকে তাঁর পরিচালনা, ব্যবস্থা ও হিকমতের মহল বানিয়েছেন। সুতরাং এগুলোর কোনো একটি থেকে সৃষ্টিজগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর হিকমত ছুটে যাবে এবং তাঁর রাজত্বের সুনিপুণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাও নষ্ট হয়ে যাবে।

(২) আল্লাহর ওলীদের ইবাদতের স্তরের পূর্ণতা প্রদান:

আল্লাহ তা'আলার ইবলীস সৃষ্টি করার পিছনে আরেকটি হিকমত এই ছিলো যে, তাঁর ওলীগণ ইবলীস ও তার চেলাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে ইবলীসের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহর ওলীরা তাঁর কাছে ইবলীসের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাইবে এবং তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করবে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর ও তাঁর ওলীদের দুশমন থেকে আশ্রয় দিবেন। এর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের জন্য দুনিয়া ও

আখিরাতের এমন সুফল অর্জিত হবে, যা তাকে সৃষ্টি না করলে অর্জন হতো না।

সেই সঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁরই উপর ভরসা করা, তাঁর জন্য ছ্বর করা, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় আল্লাহর প্রিয় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, জান-মাল খরচ ও সবকিছুর উপর আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হয়। ইবলীস সৃষ্টি করার কারণেই এগুলো অর্জিত হয়েছে।

৩) সৃষ্টিকে পরীক্ষা করা: আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে সৃষ্টি করে তাকে এমন কষ্টিপাথর বানিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করবেন। যাতে করে পবিত্র থেকে অপবিত্র, উৎকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট এবং ভালো থেকে খারাপ, মুমিন থেকে মুনাফিক আলাদা হয়ে যায়।

৪) আল্লাহ তা'আলার অতিসুন্দর নামসমূহের প্রভাব যাহির করা: আল্লাহর অতিসুন্দর নামসমূহের মধ্যে রয়েছে, النَّافِع الضَّار (ক্ষতিকারক ও কল্যাণকারী), الخَافِض الرَّافِع (নিচুকারী ও উঁচুকারী), الْمُعْطِي الْمَانِع (দানকারী ও প্রতিরোধকারী), المعِزُّ المذِلُّ (সম্মানকারী ও অপমানকারী), الحكم বিচারক, العدل ন্যায়পরায়ণ ইত্যাদি। এই নামগুলো এমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দাবি করে, যাতে নামগুলোর প্রভাব ও আহকাম প্রকাশিত হবে। আর ইবলীস সৃষ্টি করার কারণেই আল্লাহ তা'আলার এই নামগুলোর প্রভাব বের হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিকে যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর একচ্ছত্র অনুগত করে সৃষ্টি করতেন এবং সকলকেই যদি নিজ ক্ষমতা বলে মুমিন বানিয়ে ফেলতেন, তাহলে এই নামগুলোর প্রভাব অপ্রকাশিত থেকে যেতো।

৫) মানুষের স্বভাবের মধ্যে লুকায়িত ভালো-মন্দ দিকগুলো উন্মুক্ত করণ: মানুষের স্বভাবের মধ্যে ভালো-মন্দ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, পবিত্র-অপবিত্র ইত্যাদি গুণাবলী লুকায়িত রয়েছে। চকমকি পাথরের মধ্যে যেমন আগুন লুকায়িত থাকে, সেভাবেই এই গুণগুলো মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে লুকায়িত থাকে। খারাপ লোকদের স্বভাবের মধ্যে খারাপ কাজ করার প্রতি যেই আগ্রহ ও শক্তি রয়েছে, তা ভিতর থেকে বাইরে বের করার জন্য শয়তান সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো মানুষের স্বভাবের ভিতরে ভালো কাজ করার প্রতি যেই ইচ্ছা, আগ্রহ ও শক্তি রয়েছে, তা বাইরে আনার জন্য তিনি নাবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সর্বাধিক প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলা ভালো লোকদের ভিতরে যেই ভালো আছে, তা বের করেছেন, যাতে তিনি ভালো লোকদের ভালো

কাজের প্রতিদান দিতে পারেন এবং নিকৃষ্ট লোকদের ভিতর থেকে নিকৃষ্ট কাজগুলো বের করেছেন, যাতে তিনি তাদের সাজা দিতে পারেন এবং উভয় দলের মধ্যেই যেন আল্লাহ তা'আলার হিকমত প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে উভয় দলের মধ্যেই যেন তাঁর হুকুম বাস্তবায়ন হয় এবং তিনি যা জানতেন, তা যেন প্রকাশিত হয় ও তাদের কাজগুলো যেন তাঁর সাবেক ইলমের মুতাবেক হয়।

৬) আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন ও বিস্ময়কর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ: অত্যাচারী কাফেরদের অন্তর থেকে কুফুরী ও মন্দ কাজ প্রকাশিত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেক বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কুফুরীর কারণে এসেছে মহাপ্লাবন, আদ জাতির সীমালঙ্ঘনের কারণে এসেছে প্রচণ্ড বাতাস, ছামুদ জাতির কুফুরী ও পাপাচারিতার কারণে এসেছে জিবরীলের বিকট চিৎকার এবং লুত আলাইহিস সালামের জাতির কুকর্মের কারণে এসেছে তাদের বসতিকে উল্টিয়ে দিয়ে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণের শাস্তি। অনুরূপ ইবরাহীমের জন্য প্রজ্বলিত আগুনকে শান্তিময় শীতল করে দেয়ার নিদর্শন, মূসার হাতে প্রকাশিত নিদর্শন এবং অন্যান্য নিদর্শন। কাফেরদের কুফুরী এবং নাস্তিকদের নাস্তিকতা না থাকলে এই উজ্জ্বল নিদর্শনগুলো বের হতো না। যেগুলো মানুষ যুগ যুগ ধরে আলোচনা করছে।

আর ইবলীসকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়ার মাধ্যমে ইবলীসের সম্মান বৃদ্ধি করা হয়নি। বরং তার পাপ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তাকে অপদস্ত করার ইচ্ছা করেছেন এবং তার শাস্তিও যেন বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে সে যেন ভালো থেকে মন্দকে আলাদা করার কষ্টিপাথর হিসেবে থেকে যায়। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, তাই তাদের পরীক্ষাও ক্বিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। অতএব হিকমতের দাবি হলো, পৃথিবীতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষ আসার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার সাথে সাথে ইবলীসও ক্বিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি করা ও তা দ্বারা মানুষকে আক্রান্ত করার হিকমত

ইবলীস সৃষ্টি করার পিছনে যেমন মহান আল্লাহর বিশেষ হিকমত রয়েছে, অনুরূপ রোগ-ব্যাধি, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি করার পিছনেও রয়েছে অনেক হিকমত। রয়েছে তাতে এমন কল্যাণ, যা একমাত্র আল্লাহ

ছাড়া অন্য কেউ পরিপূর্ণরূপে অবগত নয়। এই হিকমত ও কল্যাণগুলো আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়া, রহমত ও ইনসাফের প্রমাণ। নিম্নে এসব হিকমতের কিছু আলোকপাত করা হলো।

১) দুঃখ-দুর্দশার ইবাদত প্রকাশ: দুঃখ-দুর্দশার ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ছ্বর-ধৈর্যের ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কাউকে যখন দুনিয়ার ভোগসামগ্রী দান করেন, তখন তারা আল্লাহর কতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাঁর ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের কারো নিয়ামত কমিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে চান যে, তারা উভয় অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে কি না এবং তারা দুঃখ-দুর্দশায় পড়ে অধৈর্য হয়ে যায় কি না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ "আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে"। (সূরা আল আম্বীয়া: ৩৫)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুর্দশা এ দু'টো দিয়েই বান্দাকে পরীক্ষা করেন। সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করতে চান, বান্দা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে কি না। আর দুঃখ-দুর্দশায় ফেলে পরীক্ষা করতে চান, বান্দা ছ্বর করে কি না এবং বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে কি না। বান্দাকে একই অবস্থায় রেখে উভয় অবস্থার ইবাদত যাচাই করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বান্দার সত্যিকার ইবাদত যাচাই করার জন্য অবস্থা পরিবর্তন করেন। নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুলো থাকার পর যখন তার নিয়ামত কমে যায়, তখনও যদি বান্দা আল্লাহর পথ থেকে সড়ে না যায়, তাহলে সেই প্রকৃত মুমিন। যেমন ছিলেন আল্লাহর নাবী আইয়্যুব আলাইহিস সালাম।

আবু ইয়াহ-ইয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

"মুমিনের ব্যাপারটি সত্যিই আশ্চর্যের। তার সবকিছুই ভালো। মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এটা নেই। তার কল্যাণ আসলে কৃতজ্ঞ হয়। এটা তার জন্য ভালো। রোগ-বালা আসলে ছ্বর করে। এটাও তার জন্য ভালো"।[৫৫]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ، فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ. يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ.

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন আমি আমার কোনো বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু অর্থাৎ তার চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে ফেলি, অতঃপর সে ছ্বর করে, তখন এর বিনিময়ে তাকে আমি জান্নাত দান করি।[৫৬]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ছ্বর দুই প্রকার। ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে ছ্বর এবং পাপকাজ থেকে ছ্বর। যেমন হাসান বাছরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, বান্দা ক্রোধের সময় তা দমন করা এবং পাপকাজ থেকে বিরত থাকার সবরের চেয়ে অধিক ছ্বর আর কোনো ক্ষেত্রেই করে না। কেননা কষ্টদায়ক বিষয়ে ছ্বর করাই প্রকৃত ছ্বর। কষ্টের সময় যে ছ্বর করে, সে-ই প্রকৃত বীর।[৫৭]

কোনো কোনো সালাফের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, সালাফদের কোনো একজন লোকের ছিল মাথায় টাক। তার শরীরে ছিল কুষ্ঠ রোগ, দু'চোখই ছিল অন্ধ এবং উভয় হাত ও উভয় পা ছিল অবশ। তিনি সবসময় বলতেন,

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً ممن خلق، وفضلني عليهم تفضيلاً

"আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে অনেক মানুষের রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ রেখেছেন এবং আমাকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন"।

তার কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি যাওয়ার সময় তাকে বললো, আল্লাহ তোমাকে কী থেকে সুস্থ রেখেছেন? তুমি অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, টাক মাথা এবং উভয় হাত ও উভয় পা অচল। তোমার সুস্থতা কোথায়? লোকটির কথা শুনে উক্ত সৎলোক বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! আল্লাহ আমাকে তাঁর যিকিরকারী জবান দিয়েছেন, কৃতজ্ঞ অন্তর দিয়েছেন এবং রোগ-ব্যাধি ও

---

[৫৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৯।

[৫৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৫৩।

[৫৭] আল-আমরু বিল মা'রুফ, পৃষ্ঠা নং ৪২।

বালা-মুছীবতে ছ্বর করার মতো শরীর দিয়েছেন। অতএব আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২) অন্তরের পবিত্রতা ও নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে নিষ্কৃতিঃ সর্বদা সুস্থ থাকা কারো কারো জন্য গর্ব-অহংকারের কারণ হয়। কেননা সুস্থতার কারণে মানুষ তার শরীরে যেই অনন্দ, ফুর্তি, শক্তি, স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করে, তাই তার জন্য সীমালঙ্ঘনের কারণ হয়। অতঃপর যখন তাকে রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত করা হয়, তখন তার মন ভেঙ্গে যায়, হৃদয় নরম হয় এবং নিকৃষ্ট স্বভাব যেমন গর্ব, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে রক্ষা পায়। এসব নিকৃষ্ট স্বভাব অন্তর থেকে বের হয়ে যায় এবং আল্লাহর প্রতি বিনয়-নম্রতা প্রবেশ করে ও মানুষের সাথে আচার-আচরণে বিনয়ী হয় এবং অহংকার বর্জন করে।

ইমাম মানবাজী (রহমাহুল্লাহ) বলেন, বিপদগ্রস্ত লোকদের জেনে রাখা আবশ্যক যে, দুনিয়ার মুছীবত যদি না থাকতো, তাহলে বান্দাদেরকে গর্ব-অহংকারের রোগ-ব্যাধি, ফিরআউনী স্বভাব ও হৃদয়ের কাঠিন্য ইত্যাদি রোগ আক্রমণ করতো। আর এটা তাদের জন্য দ্রুত কিংবা বিলম্বে ধ্বংসের কারণ হতো। তাই সর্বাধিক দয়ালু আল্লাহ তা'আলা রহমত স্বরূপ তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্ন প্রকার মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত করেন। দাম্ভিকতা, আত্ম-অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষ নামক রোগ থেকে বান্দাকে বাঁচানোর জন্য, আল্লাহর দাসত্বকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের ভিতর থেকে ধ্বংসাত্মক নিকৃষ্ট উপকরণগুলো বের করার জন্য রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়াটা তাদের জন্য ঔষধ স্বরূপ। তাই আমরা সেই মহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি বালা-মুছীবতের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে রহম করেন এবং নিয়ামত দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর বান্দাদেরকে কঠিন কঠির পরীক্ষা ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত না করতেন, তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন ও অহংকার করতো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো।

৩) মুমিনের ঈমান শক্তিশালী করাঃ আল্লাহ তা'আলা বালা-মুছীবতের মাধ্যমে মুমিনকে ঈমানের প্রশিক্ষণ দেন এবং তাঁর সবরের পরীক্ষা নেন ও তার ঈমান শক্তিশালী করেন।

৪) আল্লাহ তা'আলার প্রতাপশীলতা ও বান্দার দুর্বলতা প্রকাশঃ আল্লাহ তা'আলা হুকুম ও ফায়ছালা থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নেই। তাঁর কার্যকর বিধান ও পরীক্ষা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমরা আল্লাহর বান্দা। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই আমাদেরকে পরিচালিত করেন। আমরা আমাদের সমস্ত কাজে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করি।

আল্লাহর কাছেই আমাদের আশ্রয়স্থল। তিনি আমাদেরকে হাশরের দিন একত্রিত করবেন।

৫) ইখলাছের সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করা ও খাঁটি তাওবা করা: বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি মানুষকে জানিয়ে দেয় যে, তারা খুবই অসহায় এবং তাঁর রবের মুখাপেক্ষী। এটা তাঁকে তাঁর রবের কাছে ইখলাছের সাথে দু'আ করার আহব্বান জানায়, কাকুতি-মিনতি করার দাবি জানায় এবং খাঁটি তাওবা করার দিকে ধাবিত করে।

ইমাম সুফিয়ান (রহমাহুল্লাহ) বলেন, বান্দা যা অপছন্দ করে তাই তাঁর জন্য পছন্দনীয় জিনিসের চেয়ে উপকারী হয়। কেননা অপছন্দনীয় ও কষ্টকর জিনিস তাকে আল্লাহর কাছে দু'আ করার দাবি জানায় আর প্রিয় বস্তু তাকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়।

৬) রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্তকে গাফলতি থেকে সজাগ করা: রোগ-ব্যাধি ও মুছীবতগ্রস্তদের অনেকেই সুস্বাস্থ্য হারিয়ে আরোগ্যদানকারী তাওবা করার সুযোগ পায়, অনেক বিপদগ্রস্ত আছে, যারা ধন-সম্পদ হারিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং অনেক আল্লাহ বিমুখ লোক আছে, যারা মুছীবতে পড়ে গাফলতির ঘুম থেকে জাগ্রত হয় এবং আল্লাহর কাছে নিজের অবস্থা সংশোধন করতে সচেষ্ট হয়।

৭) রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত করে বান্দাকে সুস্থতার গুরুত্ব জানিয়ে দেয়া: কোনো জিনিসকে তার বিপরীত জিনিস ছাড়া জানা যায় না। বান্দা যখন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তখনই কেবল সুস্থতার মূল্য বুঝতে পারে। এতে করে সে সুস্থতার নিয়ামতের মর্যাদা বুঝতে পারে এবং এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে তার নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। রোগ-ব্যাধি ও ব্যথা-বেদনার পর প্রাপ্ত সুস্থতা ও নিয়ামত মানুষের নিকট খুবই মূল্যবান হয়ে থাকে।

৮) কোনো কোনো রোগ-ব্যাধি সুস্থতার কারণ হওয়া: কখনো কখনো মানুষ এক রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগ তার জন্য অন্যান্য রোগ থেকে অরোগ্য লাভের মাধ্যম হয়। মানুষ অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার পরীক্ষা করে তার শরীরে এই রোগের চেয়ে জটিল আরেকটি রোগ দেখতে পায়। এই রোগে আক্রান্ত না হলে জটিল রোগটি হয়ত আবিষ্কার হতো না।

৯) রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির অন্তরে দয়া-মায়া সৃষ্টি: যে ব্যক্তি কোনো রোগ-ব্যাধি কিংবা মুছীবতে আক্রান্ত হয়, সে তার অন্তরে অন্যান্য রোগাক্রান্তদের প্রতি দয়াশীল হয়। আর এটাই তার জন্য আল্লাহর দয়া পাওয়ার কারণ হয়। কারণ, যে ব্যক্তি যমীনের সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল হয়, আসমানের প্রভু তার প্রতি দয়া করেন।

১০) রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুছীবত আল্লাহর রহমত ও হিদায়াত পাওয়ার কারণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ছ্বরকারীদের। যখন তাঁরা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ হতে ক্ষমা ও রহমত বর্ষিত হয়। আর এরাই হয় সুপথগামী"। (সূরা আল বাকারা: ১৫৫-১৫৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছ্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা আল বাকারা: ১৫৩)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»

"পরীক্ষা যত কঠিন হয়, বিনিময়ও তত বড় হয়। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতএব যে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি এবং যে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি"।[৫৮]

১১) রোগ-ব্যাধি ছাওয়াব অর্জন ও গুনাহ মাফের কারণ: রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

[৫৮] হাসান-ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/২৩৯৬।

“মুসলিম কোন ক্লান্তি, কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও বিষণ্নতার শিকার হলে, এমনকি কাঁটাবিদ্ধ হলেও এর বদলে আল্লাহ তা‘আলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।[৫৯] কোনো কোনো সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা যদি দুনিয়ার মুছীবতে নিপতিত না হতাম, তাহলে আমরা ক্বিয়ামতের দিন একেবারে খালি হাতে উপস্থিত হতাম।[৬০] একমাত্র রোগাক্রান্ত ব্যক্তিই যে, ছাওয়াব ও বিনিময় প্রাপ্ত হয় তা নয়; বরং যেই মুসলিম ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করে, সে যদি ছাওয়াবের নিয়্যাত করে আল্লাহ তা‘আলা তাকেও ছাওয়াব দান করবেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের প্রতি যুলুম করবে না। তাকে বিপদাপদে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিবে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে সহায়তা করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের উপর হতে দুনিয়ার কোনো মুছীবত দূর করবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদাপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।[৬১]

অনুরূপ যে ব্যক্তি কোনো রোগাক্রান্ত মুসলিমকে দেখতে যায়, তাকেও ছাওয়াব দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি রোগীর সেবা-যত্ন করে তাকেও তার কাজের বিনিময় দেয়া হয়। আবু হুরায়ারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

---

[৫৯] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫৬৪১।

[৬০] বারদুল আকবাদ, পৃষ্ঠা নং-৪৬।

[৬১] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৫৮০, অধ্যায়: কিতাবুল মাযালেম ওয়াল গাযাব।

“তোমাদের মধ্যে কে আজ ছিয়ামরত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছো? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ একটি জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছে? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কে আজ একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করেছে? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এমন কে আছে যে আজ একজন রোগী দেখতে গিয়েছিল? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার ভিতরে এসব গুণের সমাহার ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।[৬২]

আর মুছীবতগুলো হচ্ছে গুনাহ এর কাফ্ফারা। মুছীবতে পতিত হয়ে ছ্বর করলে বান্দা ছাওয়াব প্রাপ্ত হয়। আর অধৈর্য হলে ও বিরক্তি প্রকাশ করলে গুনাহগার হয়। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, যখন আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হলো,

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

“যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ্ ছাড়া নিজের কোনো সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না”। (সূরা আন নিসা: ১২৩)

তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন আয়াত নাযিল হয়েছে, যা পিঠ ভেঙে দিবে। আমাদের কে আছে যে, যুলুম করেনি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তুমি কি কষ্টে নিপতিত হও না? তুমি কি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হও না? তুমি কি মুছীবতে পতিত হও না? এগুলোই হচ্ছে মুমিনের পাপকাজের সাজা”।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্লেগ মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে জানালেন যে, এটি হচ্ছে আযাব। আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা তার উপর এটা প্রেরণ করেন। আর এটিকেই আল্লাহ্ মুমিনদের জন্যে রহমত স্বরূপ

[৬২] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১০২৭, অধ্যায়: কিতাবুয্ যাকাত।

বানিয়েছেন। যে এলাকায় প্লেগ দেখা দেয়, কেউ যদি ছাওয়াবের আশায় সেখানেই অবস্থান করে আর এই দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ যে মুছীবত তার তাক্বদীরে লিখেছেন, তা ছাড়া আর কোনো মুছীবতই তার হবে না, তাহলে সে একজন শহীদের ছাওয়াব পাবে।[৬৩]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَا يَـزَالُ الـبَلَاءُ بِالـمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَـةِ فِي نَفْسِـهِ وَوَلَـدِهِ وَمَالِـهِ حَـتَّى يَلْقَـى اللَّهَ وَمَـا عَلَيْـهِ خَطِيئَةٌ»

“মুমিন নর-নারীর নিজের মধ্যে, সন্তান-সন্ততির মধ্যে এবং ধন-সম্পদের মধ্যে বালা-মুছীবত লেগেই থাকবে। পরিণামে সে আল্লাহর সাথে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকবে না”।[৬৪]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ».

“আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার কোন প্রিয় বস্তু উঠিয়ে নিলে সে যদি ছ্ববর করে, তবে তার বিনিময় হচ্ছে একমাত্র জান্নাত”।[৬৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) সবরের ফযীলত সম্পর্কে বলেন, এর মাধ্যমে দীনের নের্তৃত্ব লাভ করা যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

“আর যখন তারা ছ্ববর করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা তৈরি করে দেই যারা আমার হুকুম অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো”। (সূরা সাজদাহ: ২৪)

---

[৬৩] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৪৭৪।

[৬৪] হাসান -ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/২৩৯৯।

[৬৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৪২৪।

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ “ছ্বর হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ”।[৬৬]

ছ্বহীহ মুসলিমে উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেতে শুনেছি, যে কোনো মুসলিম মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক এই দু‘আ পাঠ করবে,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

“আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ্! তুমি আমার এই মুসীবতে ছাওয়াব ও বিনিময় দান কর এবং এর বদলে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করো, আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে সেই মুছীবতের চেয়ে উত্তম বদলা দান করবেন।[৬৭]

১২) রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-মুছীবত দুনিয়ার ভালোবাসা কমায়: দুনিয়ার সামান্য মুছীবত মানুষের দুনিয়ার জীবনকে ঘোলাটে করে দেয়, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবনকে নষ্ট করে দেয় এবং তাকে দুনিয়ার স্বাদ ভুলিয়ে দেয়। অতএব বুদ্ধিমান ও চতুর লোক দুনিয়া দ্বারা প্রতারিত হয় না। বরং দুনিয়াটাকে সে আখিরাতের শস্যক্ষেত হিসেবেই গ্রহণ করে।

১৩) বান্দা তার নিজের জন্য যা বাছাই করে, আল্লাহর বাছাই তার চেয়ে উত্তম হয়: এটা খুবই সুন্দর ও চমৎকার বাছাই। বান্দার এটা ভালোভাবে বুঝা উচিত। আল্লাহ তা‘আলা হলেন, সর্বাধিক দয়ালু ও সর্বাধিক প্রজ্ঞাবান। তিনি তাঁর বান্দাদের কল্যাণ সম্পর্কে বান্দাদের চেয়ে বেশি জানেন। মানুষের প্রতি মানুষ যেমন দয়াশীল এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা যেমন দয়াশীল, আল্লাহ তাদের প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশি দয়াবান। তাই আল্লাহ যখন তাদের উপর অপছন্দীয় কিছু চাপিয়ে দেন, তখন তা তাদের উপর না চাপানোর চেয়ে অধিক কল্যাণকর হয়। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং তাদের প্রতি দয়া করেই সেটা চাপিয়ে দেন। বান্দাদের জন্য যা কিছু ভালো, তা নির্বাচন করার দায়িত্ব যদি তাদের উপরই অর্পিত হতো, তাহলে তারা তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয় নির্বাচন করতে অক্ষম হতো। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ইলম, হিকমত, রহমত ও আদলের দাবি অনুযায়ী বান্দাদের কল্যাণকর বিষয় নির্বাচন ও তার

[৬৬] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২২৩।

[৬৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯১৮।

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। বান্দারা তা পছন্দ করুক কিংবা অপছন্দ করুক।

১৪) মানুষ তার নিজের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞঃ মানুষ কখনো কখনো এমন জিনিস কামনা করে, যার পরিণাম প্রশংসিত হয় না। আবার কখনো এমন জিনিস অপছন্দ করে, যা তার জন্য উপকারী হয়। আর আল্লাহই পরিণাম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহর ফায়ছালা পুরস্কার স্বরূপ। যদিও এতে তাকে প্রিয় বস্তু থেকে মাহরুম করা হয়। আল্লাহর ফায়ছালা তার জন্য নিয়ামত স্বরূপ। যদিও তাতে তার জন্য পরীক্ষা থাকে। তার অসুস্থতা সুস্থতা স্বরূপ যদিও তাতে কষ্ট থাকে। কিন্তু বান্দার অজ্ঞতার কারণে সেটাকেই পুরস্কার, নিয়ামত ও সুস্থতা মনে করে, যেটার মধ্যে তাৎক্ষণিক স্বাদ পায় এবং যেটা তার স্বভাব-প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত হয়। সে যদি মারেফাতের জ্ঞান প্রাপ্ত হতো, তাহলে তাক্বদীরের তিতাকে মিঠা, বঞ্চনাকে নিয়ামত এবং মুছীবতকে রহমত গণ্য করতো। সুস্থতার চেয়ে অসুস্থতাতেই বেশি আরাম ও স্বাদ উপভোগ করতো এবং দরিদ্রতাকে ধনাঢ্যের চেয়ে বেশি সুখকর মনে করতো। সেই সঙ্গে সুখে থাকার চেয়ে কষ্টে থেকেই আল্লাহর বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো।

১৫) রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্তকে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে দাখিল করাঃ রোগাক্রান্ত ও মুছীবতগ্রস্ত মুমিন বান্দারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসা পেয়ে সৌভাগ্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য বিপদাপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন। ছ্বহীহ সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে যে, বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাকে ভালোবাসার প্রমাণ। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»

"পরীক্ষা যত কঠিন হয়, বিনিময়ও তত বড় হয়। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতএব যে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি এবং যে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি"।[৬৮]

[৬৮] হাসান-ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/২৩৯৬।

১৬) প্রিয় জিনিস কখনো অপ্রিয় জিনিস ডেকে আনে; এর বিপরীতও হয়: আল্লাহ সম্পর্কে বান্দার জ্ঞান যখন বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয়, তখন সে নিশ্চিতরূপে জানতে পারে, সে যেসব অপ্রিয় ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং যেসব কষ্টদায়ক বিষয়ে সে আক্রান্ত হয়, তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণ ও উপকারী বিষয় রয়েছে, যা সে জানে না এবং যা সে কল্পনাও করতে পারে না। বরং বান্দা যা অপছন্দ করে, তাতেই তার জন্য ঐ জিনিসের চেয়ে বেশি কল্যাণ থাকে, যাকে সে পছন্দ করে। নফসের অধিকাংশ কল্যাণ তাতেই থাকে, যা সে অপছন্দ করে। যেমনিভাবে তার অধিকাংশ অকল্যাণ ও ধ্বংসাত্মক বিষয় তাতেই থাকে, যা সে পছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করতে পারো অথচ আল্লাহ তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন"। (সূরা আন নিসা: ১৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা এমন জিনিসকে পছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন। কিন্তু তোমরা জানো না। (সূরা আল বাকারা: ২১৬)

অতএব বান্দা যখন জানতে পারবে যে, অপছন্দনীয় জিনিস কখনো কল্যাণ ডেকে আনে আবার কখনো প্রিয় জিনিস অকল্যাণ ডেকে আনে, তখন আতঙ্কিত থাকবে যে, প্রিয় বস্তুর দিক থেকেও অপ্রিয় আসতে পারে এবং অপ্রিয় বস্তু হতেও যে কল্যাণ অর্জন করা যেতে পারে, তা। রোগ-ব্যাধি ও মুছীবতে আক্রান্ত হওয়ার আরো অনেক হিকমত রয়েছে। এসব হিকমত থেকে কোনো মানুষ কিছুটা জানতে পারে। সকলের পক্ষে তা জানা সম্ভব হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের জন্য পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিসকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তা সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেন। কেননা তা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে বিরাট হিকমত নিহিত থাকে। আর অধিকাংশ লোকের এসব হিকমত জানা উপকারী নয়। বরং কখনো কখনো তা ক্ষতিকর হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো না, যা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হলে তোমরা কষ্ট পাবে"। (সূরা আল মায়িদা: ১০১)

পাপাচার সৃষ্টি ও নির্ধারণ করার হিকমত

কেউ যদি প্রশ্ন করে, পাপাচার, যুলুম, অত্যাচার, কুফরী ইত্যাদি সৃষ্টি করার পিছনে কী হিকমত রয়েছে? কেনই বা আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করলেন? এগুলো সৃষ্টি না করলে তো আমরা এগুলোতে লিপ্ত হয়ে দুর্ভাগ্যবান হতাম না।

এর জবাবে আমরা বলবো, ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নির্ধারণ করেন, তাতে রয়েছে তাঁর বিরাট হিকমত ও মহা উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে অল্পই আলোচনা হয়ে থাকে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা ইলমের এক বিরাট অধ্যায়। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই এ ব্যাপারে অবগত রয়েছে। পাপাচার ও অন্যায় কাজগুলো সৃষ্টি করার পিছনে যেসব হিকমত রয়েছে, তার দরজা উন্মুক্তকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। লোকেরা শুধু আদেশ-নিষেধের হিকমতের দরজা উন্মুক্ত করেছে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার হিকমত নিয়েও তারা আলোচনা করেছে। কিন্তু সৃষ্টিজগতের পাপাচার ও অন্যায় কাজগুলো সৃষ্টি করার কী হিকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে, এ ব্যাপারে এমন আলোচনা পাওয়া যায় না, যা জ্ঞান পিপাসুর পিপাসা নিবারণ করতে পারে।

যারা বলে, বান্দার কাজ তো আল্লাহ সৃষ্টিই করেননি এবং এগুলো আল্লাহর ইচ্ছার অধীনও নয়; বান্দারাই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় তাদের কাজগুলো সৃষ্টি করে, এগুলোর হিকমত তারা কীভাবে জানতে পারবে? অথবা তারাই বা কীভাবে এগুলোর হিকমত জানতে পারবে, যারা বলে বান্দার কাজগুলো আল্লাহর সৃষ্টি করেন ঠিকই; কিন্তু তাঁর কাজগুলোর পিছনে কোনো হিকমত ও উদ্দেশ্য নিহিত নেই?

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণকৃত কাজগুলো থেকে বান্দারা তাদের ইচ্ছায় যা কিছু করে থাকে, সে

সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান গভীর নয়। আসলে তাতে রয়েছে এমন অনেক হিকমত, যা পরিপূর্ণরূপে মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমরা এখানে তা থেকে কিছু হিকমতের প্রতি ইঙ্গিত করবো ইনশা-আল্লাহ।[৬৯]

অতঃপর তিনি পাপাচার, যুলুম, কুফুরী ও অন্যায় কাজগুলো সৃষ্টি করার অনেকগুলো হিকমত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আমরা কিছু হিকমত উল্লেখ করছি।

১) গুনাহ ও পাপাচার সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাওবার ইবাদত বাস্তবায়ন: তাওবা বিরাট একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'আলার কাছে বান্দার তাওবা অত্যন্ত প্রিয়। এমনকি বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে তার বাহনে আরোহণ করে সফরে বের হয়। বাহনের উপরেই থাকে তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামের সে একটি গাছের নীচে আশ্রয় নেয়। অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখে তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে তার বাহন খুঁজে না পেয়ে ভাবলো যে, তার মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা করে যেখান থেকে তার বাহন হারিয়েছে সেখানে গিয়েই মৃত্যু বরণ করবে। সুতরাং নিরাশ হয়ে সেই গাছের নীচে এসে ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায়, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে বসেছে।[৭০] এই ব্যক্তি তার হারানো বস্তু ফেরত পেয়ে যতটা খুশি হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা করাতে আরো বেশি খুশি হন।

এর চেয়ে বেশি খুশির বিষয় আর কী হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা পাপাচার সৃষ্টি করেন। বান্দা তাতে লিপ্ত হয়। অতঃপর যদি বান্দার শেষ পরিণাম ভালো হওয়া নির্ধারিত থাকে, তাহলে বান্দা আল্লাহর ফায়ছালা ও ইচ্ছা অনুযায়ী তাওবা করে। আল্লাহ এতে খুশি হন এবং বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। ফলে আল্লাহর গাফ্ফার ও গাফুর নামের প্রভাব বান্দার উপর পড়ে। বান্দা এ দ্বারা উপকৃত হয়। অতএব আল্লাহ তা'আলা যদি পাপাচার ও অন্যায় কাজ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার গাফফার ও গাফুর নামের প্রভাব কার উপর পতিত হতো? কীভাবে এই নামগুলো দ্বারা আল্লাহ

---

[৬৯] দেখুন: মিমতাহু দারিস সাআদাহ, (১/২৮৬)

[৭০] মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাওবা।

তা'আলার নামকরণ করা শোভনীয় হতো? আর যদি তার উপর দুর্ভাগ্যবান হওয়া নির্ধারণ করে থাকেন, তাহলে সে তাওবা করার তাওফীক পায় না। এতে বান্দার উপর আল্লাহর আদল (ন্যায়-ইনসাফের) দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বান্দার পাপাচারের কারণে বান্দা শাস্তি পায়।

তাওবা মানুষের জীবনে এমন সুফল বয়ে আনে, যা তাওবা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। তাওবা আল্লাহর ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ, প্রশংসা ও সন্তুষ্টি পাওয়ার বিরাট মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারার ২২২ নং আয়াতে বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ "যারা তাওবা করে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন"। অতএব, পাপাচার ও অন্যায় কাজ সৃষ্টি না হলে বান্দা আল্লাহর এত বড় নিয়ামত পেয়ে ধন্য হতে পারতো না।

২) গুনাহ ও পাপাচার সৃষ্টির মাধ্যমে বান্দার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণ: আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর অনুগ্রহ করা পছন্দ করেন। তিনি তাঁর বান্দার উপর নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান এবং তাঁর দয়ার স্থানগুলো বান্দাকে দেখাতে ভালোবাসেন। এ জন্যই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত অনুগ্রহ দেখিয়েছেন।

বান্দার উপর আল্লাহর পরিপূর্ণ দয়া-অনুগ্রহের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, যে মন্দ আমল করে, তিনি তাঁর প্রতি দয়া করেন, যে যুলুম করে, তাঁকে মা'ফ করেন, যে গুনাহ করে, তাঁকে ক্ষমা করেন, যে তাঁর নিকট তাওবা করে, তিনি তার তাওবা কবুল করেন এবং যে তাঁর নিকট ক্ষমা চায়, তিনি তাকে ক্ষমা করেন। এ জন্যই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এসব গুণাবলী ও প্রশংসনীয় স্বভাবে গুণান্বিত হওয়ার আহব্বান জানিয়েছেন। আর তিনি এগুলোতে গুণান্বিত হওয়ার আরো বেশি উপযুক্ত। এজন্যই তিনি পাপাচার, যুলুম ও খারাপ কাজগুলো সৃষ্টি করেছেন, যাতে আল্লাহর দয়া, মার্জনা, ক্ষমা ইত্যাদি প্রশংসনীয় ছিফাত প্রকাশিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে পাপাচার ও অন্যায় কাজ সৃষ্টি ও নির্ধারণ করার মধ্যে এমন হিকমত ও শুভ পরিণাম রয়েছে, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে হয়রান করে দেয়। আল্লাহ যদি চাইতেন, পৃথিবীতে চোখের পলক পরিমাণও পাপাচার না হোক, তাহলে কখনো কোনো পাপাচার হতো না। কিন্তু তিনি তাঁর বিরাট উদ্দেশ্য ও হিকমতের দাবিতেই তা চেয়েছেন।

৩) গুনাহ ও পাপাচার আল্লাহর হেফাযত, সাহায্য ও সংরক্ষণের প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষীতা: শিশু বাঁচ্চা যেমন তার পিতা-মাতার হেফাযত, সাহায্য ও সংরক্ষণের প্রতি মুখাপেক্ষী, বান্দাও তেমনি আল্লাহর হেফাযত, সাহায্য ও

সংরক্ষণের প্রতি সবসময়ই মুখাপেক্ষী। আল্লাহ যদি তাঁকে হেফাযত ও সংরক্ষণ না করেন, তাহলে বান্দার জন্য ধ্বংস আবশ্যক। তাই আল্লাহ যদি ধ্বংসের উপকরণ যেমন গুণাহ ও পাপাচার ইত্যাদি সৃষ্টি না করতেন, তাহলে তাঁর সংরক্ষণ, হেফাযত ও সাহায্য ইত্যাদি গুণাবলী দ্বারা কেউ উপকৃত হতো না।

৪) গুনাহ ও পাপাচার সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির ইবাদত বাস্তবায়ন: আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে যেসব ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, দু'আ ও ফরিয়াদ করা। এগুলো বান্দার সৌভাগ্য লাভের বিরাট মাধ্যম। ইবলীস, গুনাহ ও পাপাচার আল্লাহ সৃষ্টি না করলে, বান্দা কার প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতো? কার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতো?

৫) গুনাহ ও পাপাচার সৃষ্টি করে বান্দাকে তাঁর নফসের হাকীকত জানিয়ে দেয়া: পাপাচার, গুনাহ, যুলুম ইত্যাদি সৃষ্টি ও নির্ধারণ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ খুবই মূর্খ ও যালেম। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বান্দা যখন যুলুম করে ফেলে, তখন সে তার নফসের হাকীকত বুঝতে সক্ষম হয়। সে বুঝতে পারে, তাঁর নফসই হলো, অকল্যাণ ও পাপাচারের খনি ও ভাণ্ডার। আরো বুঝতে পারে যে, তার মধ্যে রয়েছে এমন ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা দূর করা আবশ্যক এবং নফসকে কামালিয়াতের স্তরে উন্নীত করতে হলে নফসের মালিক ও সংরক্ষকের দ্বারস্ত হওয়াও আবশ্যক। পৃথিবীতে এই পাপাচার ও অন্যায় কাজগুলো সৃষ্টি না হলে আমাদের নফসের দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আমরা ধরতে পারতাম না এবং নফসকে সংশোধন করাও সম্ভব হতো না।

৬) পাপাচার-গুনাহ বান্দার সৎ আমলের বাহাদুরী ও অহংকার দূর করার মাধ্যম: পাপাচার, অন্যায় গুনাহর কাজগুলো সৃষ্টি না করলে, আনুগত্যের আধিক্য নিয়ে বান্দার বড়াই ও গর্ব করার আশঙ্কা ছিল, যা বান্দার জন্য মোটেই সমীচীন নয়। বান্দার সামনে পাপ কাজ করার সুযোগ না থাকলে হয়তবা আনুগত্য নিয়ে অহংকারের কারণে আনুগত্যই তার বিপদ ডেকে আনত। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবি এমন ছিল যে, তিনি অনুগত বান্দাকে দিয়েও কখনো কখনো ভুল-ত্রুটি করাবেন। যাতে বান্দার অন্তরে ইবাদতের অহংকার সৃষ্টি না হয় এবং তার ইবাদত যেন সংরক্ষিত হয়। পাপাচার সৃষ্টি না করলে এই বিরাট উদ্দেশ্য ও হিকমত ছুটে যেতো।

৭) **পাপাচার-গুনাহর মাধ্যমে বান্দার হৃদয়ে আল্লাহর ভয়-ভীতির উদয়ঃ** আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের উপর বিভিন্ন শ্রেণির ইবাদত আবশ্যক করেছেন। যেমন করেছেন তার শরীরের উপর। ভয়-ভীতি, আশঙ্কা, ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্খা, সন্তুষ্টি কামনা ইত্যাদি অন্তরের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এসব ইবাদত বাস্তবায়িত হওয়ার অনেক কারণ ও উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যদি এসব কারণ যেমন খারাপ কাজ, পাপাচার, গুনাহ অবাধ্যতা ইত্যাদি সৃষ্টি না করতেন, তাহলে অন্তরের ইবাদতগুলো বাস্তবায়ন হতো না। তাই আমরা দেখতে পাই, বান্দার সামনে বিভিন্ন পাপাচার ও গুনাহর কাজ ও এর উপকরণ বিদ্যমান থাকার কারণে তার অন্তরে আল্লাহর এমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়, অনেক শ্রেণির ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয় না। অতএব এমন অনেক গুনাহ আছে, যা বান্দার ইস্তেকামাতের কারণ হয়, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার উপায় হয় এবং সীমালঙ্ঘনের পথ পরিহার করারও সুযোগ হয়।

ছ্বহীহ বুখারীতে ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, অতীতকালে তিনজন লোক পথ চলতেছিল। পথিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। উপর থেকে বিশাল আকারের একটি পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের জন্য বের হওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইল না। তাদের একজন অপরজনকে বলতে লাগল, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন সৎআমল আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে তার উছীলা দিয়ে দু'আ কর। এতে হয়ত আল্লাহ আমাদের জন্য বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন।

তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল, আমার কতিপয় শিশু সন্তানও ছিল। আমি ছিলাম তাদের জন্য একমাত্র উপার্জনকারী। আমি প্রতিদিন ছাগল চরানোর জন্য মাঠে চলে যেতাম। বিকালে ঘরে ফেরত এসে দুধ দহন করে আমি প্রথমে পিতা-মাতাকে পান করাতাম, পরে আমার শিশু সন্তানদেরকে পান করাতাম। এটি ছিল আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। একদিন ঘাসের সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম। এসে দেখি আমার পিতা-মাতা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার অভ্যাসমত আমি দুধ দহন করে দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করাকে অপছন্দ করলাম। যেমন অপছন্দ করলাম পিতা-মাতার পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করানোকেও। শিশু সন্তানগুলো আমার পায়ের কাছে ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করছিল। এভাবে সারারাত কেটে গিয়ে ফজর উদীত হল। আমার পিতা-

মাতা ঘুম থেকে জাগলেন। আমি তাদেরকে প্রথমে পান করালাম অতঃপর আমার ছেলে-মেয়েদেরকে পান করালাম।

হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমি এ কাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই সম্পাদন করেছি। এই আমলটির উছীলায় আমাদের জন্য বের হওয়ার রাস্তা করে দিন। এভাবে দু'আ করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল, তারা আকাশ দেখতে পেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা হয়নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল। সে ছিল আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং একজন পুরুষ কোনো মহিলার প্রতি যতদূর আসক্ত হতে পারে, আমি ছিলাম তার প্রতি ততটুকু আসক্ত। আমি তার কাছে আমার মনোবাসনা পেশ করলাম। সে একশত স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার শর্তে তাতে সম্মত হল। আমি অনেক পরিশ্রম করে একশত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে তার কাছে গমন করলাম। সে সম্মতি প্রকাশ করার পর আমি তার উভয় উরুর মধ্যে বসে পড়লাম। এমন সময় সে বলে উঠল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর, আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। একথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। এমনকি স্বর্ণ মুদ্রাও তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার ভয়ে সেদিন পাপের কাজ থেকে বিরত হয়েছি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি আরো একটু সরে গেল কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা হয়নি।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! নির্ধারিত বেতনের বিনিময়ে আমি একজন শ্রমিক নিয়োগ করলাম। কাজ শেষ করে সে আমার কাছে পারিশ্রমিক চাইলে আমি তা প্রদান করলাম, কিন্তু সে তা গ্রহণ না করেই চলে গেল। আমি তার প্রাপ্য টাকা বাড়াতে থাকলাম। একপর্যায়ে তা একপাল গরুতে পরিণত হল। আমি গরুগুলো মাঠে চরানোর জন্য একজন রাখালও নিয়োগ করলাম। অনেক দিন পর সেই লোকটি আমার কাছে এসে তার মজুরী চাইল। আমি বললাম, তুমি রাখালসহ উক্ত গরুর পালটি নিয়ে চলে যাও। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং আমার সাথে বিদ্রুপ করো না। আমি বললাম, বিদ্রুপ করি নাই। বরং এগুলো তোমার। আমি তোমার এক দিনের মজুরী দিয়ে এগুলো করেছি। তাই তুমি রাখালসহ গরুর পালটি নিয়ে চলে যাও। অতঃপর সে গরুর পালটি নিয়ে চলে গেল। একটিও রেখে যায়নি। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করেছি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার

ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। তারা নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে এল।

উপরোক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, পাপাচারের ইচ্ছা অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তা বর্জন করাই যুবক লোকটিকে সংশোধন করেছে এবং তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি এক বিরাট ভীতির সঞ্চার করেছে। এতে পাপাচার ও অন্যায় সৃষ্টি করার হিকমত ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

৮) শয়তানকে লাঞ্ছিত, অপদস্ত করা: কখনো কখনো মানুষের অন্তর তার শত্রুকে ভুলে যায় এবং তার শত্রুতা সম্পর্কে উদাসীন থাকে। অতঃপর সচেতন মুমিন বান্দার হৃদয় যখন তার শত্রু থেকে ক্ষতিকর কিছু অনুভব করে, তখন অন্তর তার শক্তি সঞ্চয় করে এবং তার দুশমন থেকে প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে ও শত্রুর মোকাবেলায় ঝাপিয়ে পড়ে।

শত্রুর মোকাবেলায় অন্তরের এই আক্রমণকে একটি শক্তিশালী বীর পুরুষের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বীরপুরুষ যখন আহত হয়, তখন সে স্থির থাকতে পারে না। তার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। সে তখন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঝাপিয়ে পড়ে। অনুরূপ শত্রুর মোকাবেলায় অন্তরের আক্রমণকে সিংহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সিংহ যেমন তার উপর কারো আক্রমণ বরদাশত করতে পারে না, সচেতন অন্তর তার শত্রুর আঘাত সহ্য করতে পারে না। সুতরাং যে নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করে না এবং শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ নিতে চায় না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। অন্তরের শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া ছাড়া অন্য কিছুতেই অন্তর শান্ত হয় না। আর শয়তানই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় শত্রু। সচেতন মুমিনের অন্তরকে শয়তানই সবচেয়ে বেশি আঘাত ও কষ্ট দেয়। তাই মর্যাদার ময়দানে প্রতিযোগিতাকারী মুমিন ব্যক্তির অন্তর সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান দ্বারা কখনো কখনো আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আঘাতপ্রাপ্ত হয়েই প্রতিশোধ নিতে লাফিয়ে উঠে এবং চিরশত্রু শয়তান থেকে প্রতিশোধ নেয় ও তাকে রাগান্বিত করে। শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকায় কৃত অপরাধ বর্জন করা এবং খাঁটি তাওবা শয়তানের মাথায় বজ্রপাত ও অন্তরের দহন স্বরূপ।

কোনা কোনো সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পাপাচারের পর মুমিন বান্দার তাওবা শয়তানকে ঐরকমই কাহিল করে ফেলে যেমন সফরে মুসাফির তার বাহনকে ক্লান্ত করে দেয়।

৯) আল্লাহ তা'আলা নূর দ্বারা ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে আনুগত্যের স্বভাব ছাড়া অন্য কিছু স্থাপন করেননি। তাদের সামনে

প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা, উত্তেজনা ইত্যাদি কিছুই সৃষ্টি করেননি। তাই তাদের সামনে আনুগত্য করা ব্যতীত আর কিছুই করার সুযোগ রাখা হয়নি। তাই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মতো আরেকটি জাতি সৃষ্টি করার ইচ্ছাই করেননি। তিনি চেয়েছেন এমন আরেক শ্রেণির মাখলুক সৃষ্টি করবেন, যাদের মধ্যে আনুগত্য ও অবাধ্যতা এই দু'টি স্বভাবই থাকবে। তারা তাদের অবাধ্যতার স্বভাব, কুপ্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা ইত্যাদি দমন করে আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে। এতে ফেরেশতাদের ইবাদতের চেয়ে ভিন্ন আরেক শ্রেণির ইবাদত বাস্তবায়িত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে ভালো-মন্দ দু'টিই সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে পাপাচারের আগ্রহও সৃষ্টি করেছেন। অতএব, কুফুরী, অনাচার, পাপাচার, যুলুম অবাধ্যতা ইত্যাদি সৃষ্টি না করলে এই বিরাট হিকমত বাস্তবায়ন হতো না।

আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন এবং যা কিছু ফায়ছালা করেছেন তার সবগুলোর প্রতিই কি সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক?

আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করেন এবং যা কিছুর ফায়ছালা করেন, তার প্রত্যেকটির প্রতিই সন্তুষ্ট থাকা আমাদের উপর আবশ্যক নয়। আমরা এ ব্যাপারে আদিষ্টও হয়নি। কুরআন সুন্নাতে এই মর্মে কোনো দলীলও নেই। বরং বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এই প্রশ্নের চারটি জবাব দিয়েছেন। প্রত্যেকটি জবাবই উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে যথেষ্ট ও সন্তোষজনক। আর সবগুলো একত্রিত করলে জবাবগুলো আরো পরিষ্কার হয় এবং উপরোক্ত সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করে।

১ নং জবাবঃ তাক্বদীরের যেসব বিষয়ে আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকার আদেশ করা হয়েছে, তা হলো তাক্বদীরের বিপদাপদ ও মুছীবত। আল্লাহ তা'আলা পাপাচার ও গুনাহর কাজ নির্ধারণ করেছেন কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট থাকার আদেশ দেননি। অতএব আমরা যখন অসুখ-বিসুখ ও অভাব-অনটন, অপ্রিয় বিষয় কিংবা প্রিয়জনকে হারানো ইত্যাদির মুছীবতে আক্রান্ত হবো, তখন ছ্বর করা আবশ্যক। তবে এতে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক কিনা এতে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে এতে সন্তুষ্ট থাকা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব হওয়ার কোনো আদেশ ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। আর এটা অধিকাংশ লোকের ক্ষমতার বাইরে। কেননা ছ্বর হচ্ছে অন্তরকে অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে, জবানকে অভিযোগ পেশ করা থেকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অসন্তোষ

মোতাবেক কাজ করা যেমন মাথার চুল টেনে উপড়িয়ে ফেলা, পরিহিত জামা ছিড়ে ফেলা, মাথায় মাটি নিক্ষেপ করা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখার নাম। এভাবে ছ্বর করা ওয়াজিব। কারণ, বান্দা এটা করতে সক্ষম।

আর বিপদাপদ, মুছীবত ও রোগ-ব্যাধির সময় সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো, মুছীবতের সময় ছ্বর করার পাশাপাশি অন্তরে শান্তি অনুভব করা এবং অন্তরে এমন আকাঙ্খার উদয় না হওয়া: আহ! যদি এই মুছীবতটি না হতো! যদি আমি এই কঠিন রোগে আক্রান্ত না হতাম! অন্তরে এমন অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া অধিকাংশ সৃষ্টির কাছেই খুব কঠিন। তাই আল্লাহ এটা আবশ্যক করেননি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালামও এটা ওয়াজিব করেননি। আর এটা যেহেতু অত্যন্ত উঁচু স্তরের কাজ, তাই এটা মুস্তাহাব বিষয় মাত্র।

আর পাপাচার ও অন্যায়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আমাদেরকে এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার আদেশ দেয়া হয়নি। এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার কোনো ছ্বহীহ কিংবা যঈফ দলীল নেই।

২ নং জবাব: একদল আলেম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুফরী করা পছন্দ করেন না। তিনি পছন্দ করেন না যে, আমরা পাপাচারে লিপ্ত হই। তাই আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আমরা আমাদের প্রভুর পছন্দ মোতাবেক কাজ করবো। তিনি আমাদের জন্য যা কিছু অপছন্দ করেছেন, তা এড়িয়ে চলবো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ "কিন্তু তিনি তাঁর বান্দার জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না"। (সূরা আয যুমার: ৭)

মোটকথা, সৃষ্টিজগতে যা কিছু হয়, সবই আল্লাহর পছন্দ অনুপাতে হয় না। আল্লাহ তা'আলা পাপাচার সৃষ্টি করেছেন, নির্ধারণ করেছেন এবং তা হতে বান্দাদেরকে নিষেধ করেছেন। পাপাচারী থেকে যে পাপাচার সংঘটিত হয়, তাও আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়; কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে তিনি আনুগত্যের কাজসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং বান্দাদেরকে তা বাস্তবায়ন করার হুকুম করেছেন। আনুগত্যের কাজ বাস্তবায়ন হওয়াকে তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন।

আল্লাহ তা'আলা কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতা অপছন্দ করেন। এগুলো অপছন্দ করা ও তা বর্জন করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। সেই সঙ্গে তিনি ঈমান, আনুগত্য ও সৎ আমল আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন। এগুলো পছন্দ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা দীনের অন্তর্ভুক্ত।

৩ নং জবাব: বান্দার কাজ-কর্ম নির্ধারণ করা এক জিনিস এবং বান্দা যা কিছু

করে, তা আরেক জিনিস। আল্লাহ যা কিছু ফায়ছালা ও নির্ধারণ করেন তাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকবো। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহর ছিফাত ও কাজ। আর বান্দা থেকে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা বান্দারই কাজ। বান্দার কাজ অনেক প্রকার। যেমন ঈমান ও আনুগত্য। এতে আমরা সন্তুষ্ট থাকবো। কুফরী ও অবাধ্যতায় সন্তুষ্ট থাকা আমাদের জন্য বৈধ নয়। বরং আমাদের উচিত এগুলো অপছন্দ ও ঘৃণা করা এবং এমন উপায় উপকরণ অবলম্বন করা যাতে এগুলোর প্রভাব মুছে যায়। যেমন তাওবা করা, ক্ষমা চাওয়া, পাপাচার মোচনকারী সৎকাজ সম্পন্ন করা এবং যারা এগুলোতে লিপ্ত হবে তাদের উপর শাস্তি কায়েমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৪ নং জবাব: পাপাচার ও অবাধ্যতার সম্বন্ধ বিভিন্ন রকম হয়। আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হবে এগুলো সৃষ্টি করা ও নির্ধারণ করা। আর বান্দার দিকে সম্বন্ধ করা হলে এগুলোর অর্থ হয় সম্পন্ন করা, বাস্তবায়ন করা কিংবা বর্জন করা। যখন আল্লাহর দিকে এগুলোর সম্বন্ধ করা হয়, তখন যেহেতু অর্থ হয় ফায়ছালা করা, নির্ধারণ করা, সৃষ্টি করা, তাই আমরা আল্লাহর قضاء وقدر তথা ফায়ছালা ও নির্ধারণের প্রতি এই দিক থেকে সন্তুষ্ট থাকবো। আর এগুলোর সম্বন্ধ যখন বান্দার প্রতি করা হবে অর্থাৎ যখন বান্দার দ্বারা এগুলো সম্পন্ন করা হবে তখন আমরা এগুলো ঘৃণা ও অপছন্দ করবো। সেই সঙ্গে সাধ্যানুযায়ী এগুলো দূর করার চেষ্টা করবো।

স্থিরীকৃত তাক্বদীর ও ঝুলন্ত তাক্বদীর

কুরআনের কিছু কিছু আয়াত ও রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু কিছু হাদীছ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়। কেউ কেউ বলে, আল্লাহ যখন সবকিছু জানেন এবং যেহেতু তিনি তাঁর নিকটস্থ কিতাবে লিখে রেখেছেন, তখন আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী: **يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ** “আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকট রয়েছে মূল কিতাব” এর কী অর্থ হতে পারে? কেউ কেউ আরো প্রশ্ন করে যে, রিযিক যেহেতু লিপিবদ্ধ আছে এবং বয়স যেহেতু নির্ধারিত আছে, তাতে কোনো বাড়তি বা কমতি হয় না, তাহলে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

“যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা দান করা হোক এবং বয়স বৃদ্ধি করা হোক সে যেন (রক্ত সম্পর্কীয়) আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায়

রাখে”[৭১] এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

এর জবাব হলো, তাক্বদীর হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে সুসাব্যস্ত তাক্বদীর। অন্যটি হচ্ছে ঝুলন্ত তাক্বদীর। লাওহুল মাহফুযে যেই তাক্বদীর লিখা রয়েছে, তা হচ্ছে সুসাব্যস্ত তাক্বদীর। এটা পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন হয় না। আর ঝুলন্ত তাক্বদীর থাকে ফেরেশতাদের হাতে। এই শ্রেণির তাক্বদীরের মধ্যেই রদবদল হয়ে থাকে। মৃত্যু, রিযিক এবং বয়স মূল কিতাব তথা লাওহুল মাহফুযে সুসাব্যস্ত ও লিখিত রয়েছে। তাতে কোনো পরবর্তন ও পরিবর্ধন হয় না। ফেরেশতাদের হাতে যেই তাক্বদীর থাকে তাতে পরিবর্তন ও কমবেশী হয়ে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাক্বদীর হচ্ছে দু'টি। পূর্ণাঙ্গ ও নিরংকুশ তাক্বদীর। আরেকটি হচ্ছে শর্তযুক্ত তাক্বদীর। এভাবে শ্রেণি বিন্যাস করার মাধ্যমেই রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

“যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা দান করা হোক এবং বয়স বৃদ্ধি করা হোক সে যেন (রক্ত সম্পর্কীয়) আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে”[৭২]।

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকে বান্দার জন্য একটি বয়স লিখার আদেশ করেন এবং বলে দেন, সে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে, তাহলে তার বয়স এই পরিমাণ বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু সেই ফেরেশতা জানে না, তার বয়স বাড়াবে হবে কি না। ঐদিকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানেন বয়স কোনটি স্থিরকৃত হয়েছে। সেই স্থিরকৃত বয়স শেষ হয়ে গেলে তাতে কমবেশি করা হয় না।

অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে যে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) কে একবার রিযিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, রিযিক কি বাড়ে ও কমে? জবাবে তিনি বলেছেন, রিযিক দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণি হচ্ছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, তিনি অমুক বান্দাকে অমুক কে রিযিক দিবেন। এতে কোন পরিবর্তন হয় না। কারণ,

---

[৭১] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২০৬৭।

[৭২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২০৬৭।

আল্লাহর ইলমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ও নিত্য-নতুন হয় না। আর যেটা ফেরেশতাদেরকে জানিয়েছন। এতে বান্দার প্রচেষ্টা অনুযায়ী কমবেশি হয়।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলেন যে, অমুকের বয়স ১০০ বছর, যদি সে আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করে। আর যদি সে আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার না করে, তাহলে তার বয়স ৬০ বছর। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানেন যে, সে আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করবে কি না। আল্লাহর ইলমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। আর ফেরেশতাদের ইলমের মধ্যে যা রয়েছে, তাতে কমবেশি হওয়া সম্ভব। আর এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

"আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকট রয়েছে মূল কিতাব"। অতএব বাড়তি বা কমতি ফেরেশতাদের ইলমের মধ্যেই হয়ে থাকে।

আর উম্মুল কিতাবে যা লিখিত আছে, সেটাই রয়েছে আল্লাহর ইলমের মধ্যে। তা কখনো মুছা হয় না। এটাকেই বলা হয় তাক্বদীরুল মুবরাম আর প্রথমটাকে বলা হয় তাক্বদীরুল মুআল্লাক। আর যেসব উপায়-উপকরণের মাধ্যমে রিযিক অর্জন করা হয়, তাও আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন ও লিখেছেন। পূর্বে যদি নির্ধারিত থাকে যে, তিনি বান্দাকে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার মাধ্যমে রিযিক দিবেন, তাহলে চেষ্টা করার ইলহাম করেন অর্থাৎ তার অন্তরকে সেই দিকে ধাবিত করেন।

পরিশ্রম ও চেষ্টা করে যেই রিযিক অর্জন করা যাবে বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা পরিশ্রম ছাড়া পাওয়া যাবে না। আর যা কিছু বিনা পরিশ্রমে আসবে বলে লিপিবদ্ধ করা আছে, বিনা পরিশ্রমেই আসবে। যেমন মৃত্যু বরণকারীর ওয়ারিছরা বিনা পরিশ্রমেই সম্পদ অর্জন করে থাকে। পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আগে থেকেই জ্ঞান রাখার পরিপন্থি নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণির অর্জন সম্পর্কে আগেই অবগত রয়েছেন। যে ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে অর্জন করে আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে অর্জন করে, এই উভয় শ্রেণির অর্জন সম্পর্কে জানেন। পরিশ্রম করে অর্জন করা আল্লাহর ইলমের পরিপন্থি নয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার পরিশ্রম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত জীবিকা সম্পর্কে জানেন। কী পরিশ্রম করে অর্জন করবে, তাও জানেন এবং ফলাফলকে পরিশ্রেমের সাথে গেঁথে দেন। তিনি আহার করা ও পান করার মাধ্যমে ক্ষুধা ও পিপাসা বিদূরিত

হওয়া নির্ধারণ করেছেন। বিবাহ করে সহবাস করার মাধ্যমে সন্তান লাভ হওয়া নির্ধারণ করেছেন। বীজ বপন করার মাধ্যমে ফসল অর্জিত হওয়া নির্ধারণ করেছেন। কোন বুদ্ধিমান লোক কি বলতে পারে যে, পরিশ্রম করে ফলাফল অর্জন করা অগ্রবর্তী ইলমের পরিপন্থি? মোটকথা, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের পরিপন্থি নয়।

আল্লামা আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সকল শ্রেণির তাক্বদীরই উম্মুল কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। যা কিছু অর্জন করার জন্য কাজ-কর্ম করা ও উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার শর্তারোপ করা হয়েছে, শর্ত পূরণ হলেই অর্জিত হবে এবং যা কিছু উপায়-উপকরণের সাথে শর্তযুক্ত নয়, তার জন্য নির্ধারিত সময়েই তা অর্জিত হবে, নির্ধারিত সময়ের আগে কিংবা পরে হবে না। বান্দাকে আদেশ বাস্তবায়ন করার আদেশ করা হয়েছে, নিষেধ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। যাকে যা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য তাই সহজ করা হয়েছে।

যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাক্বদীর সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি বলেছে, اعملوا فكل ميسر لما خلق له "তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক মানুষকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই আমল সহজ করে দেয়া হবে।

মানুষ কি তার কাজে বাধ্য না স্বাধীন?

এই প্রশ্নটি দর্শন শাস্ত্রের কিতাব ও যুক্তবিদ্যা বিষয়ক কিতাবগুলোতে বেশি বেশি হয়ে থাকে। এমনকি পরবর্তী যুগের লেখকদের বই-পুস্তকগুলোতেও এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হচ্ছে। কেউ কেউ এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, মানুষ সম্পূর্ণ পরাধীন। জীবন তরী পারাপারের ক্ষেত্রে তার কোনো নিজস্ব ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই। সে সম্পূর্ণরূপে অন্যের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। তাদের মতে মানুষ মূলত গাছের ডাল-পালা ও পাতার ন্যায়। বাতাস এগুলোকে নড়ায়। তাই নড়ে। মানুষ গোসল দানকারীর হাতে মরা লাশের মতই। গোসল দানকারী লাশকে যেভাবে ঘুরায়, লাশ সেভাবেই ঘুরে। লাশের কিছুই করার থাকে না। অপর পক্ষে কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন যে, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে নিজের কাজ নিজেই করে। সে অন্য কারো দ্বারা মোটেই পরিচালিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটির এহেন সংক্ষিপ্ত উত্তর সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এভাবে এই প্রশ্নের জবাব দেয়া ঠিক নয়। প্রশ্নটির জবাব দেয়ার আগে একটি ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম মতের পক্ষের লোকদের জবাবের মধ্যে ভুলটা এরকম যে, যদি বলি মানুষ সম্পূর্ণরূপে বাধ্য, তার কোনো ইচ্ছা বা স্বাধীনতা নেই এবং সে অন্যের দ্বারা পরিচালিত, তাহলে এই কথার মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা হচ্ছে, কীভাবে তার কাজের হিসাব নেয়া হবে? অথচ সে তার কাজে মোটেই স্বাধীন নয় কিংবা তার কাজগুলো তার ইচ্ছাতে পরিচালিত হচ্ছে না। বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি যে, তার কাজে তার ইচ্ছা আছে, কাজ করার ক্ষমতা আছে এবং তার নিজের স্বাধীনতাও আছে। ঐদিকে কুরআন ও সুন্নাহর ঐসব বক্তব্যরই বা কী জবাব দেয়া হবে, যেখানে বান্দার ইচ্ছা, স্বাধীনতা, কাজ করার শক্তি ইত্যাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে?

আর যদি বলি বান্দা তার কাজে অথবা বান্দার মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হয়, তাতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তার কোনো কাজই অন্যের ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় পরিচালিত হয় না, তাতেও একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। যারা এই মতের পক্ষে তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সে কীভাবে তার সমস্ত কাজে স্বাধীন হতে পারে? অথচ আমরা দেখছি যে, এক সময় তার অস্তিত্ব ছিল না। পরে সে জন্মগ্রহণ করেছে এবং অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার জন্মগ্রহণ ও অস্তিত্ব গ্রহণে তার কোনো ইচ্ছা ও স্বাধীনতা ছিল কি? মানুষ অসুস্থ হয়, মৃত্যু বরণ করে। এগুলো তার মধ্যেই ঘটে। এগুলোতে কি তার কোনো ইচ্ছা থাকে? মানুষ লম্বা হয়, খাটো হয় এবং উঁচু বিল্ডিংএর উপর থেকে মানুষকে নিক্ষেপ করা হলে নীচের দিকে পড়তে থাকে। এগুলোতে তার কোনো ইচ্ছা থাকে? এমনই আরো অনেক কাজ মানুষের দ্বারা কিংবা মানুষের মধ্যেই সংঘটিত হয়। এতে মানুষের কোনো ইচ্ছা মোটেই থাকে না।

আর যদি বলা হয়, বান্দার যেসব কাজ তার ইচ্ছায় হয়, তাতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন; কিন্তু সেগুলো তার ইচ্ছায় হয় না, সেগুলোতে সে স্বাধীন নয়, তাহলেও কথাটিতে আপত্তি রয়েছে। কেননা বান্দা কখনো এমন কাজের ইচ্ছা করে এবং তা বাস্তবায়ন করার দৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যা সে করার ক্ষমতা রাখে। অতঃপর তা করে ফেলে। আবার কখনো সে তা করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও করতে পারে না। কাজটি বাস্তবায়ন করার পথে প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। এতে বুঝা গেলো, মানুষ যা করার ইচ্ছা করে, তার প্রত্যেকটাই করতে পারে না। বাস্তবে আমরা এটাই দেখছি।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐসব লোকের জবাব ভুল প্রমাণিত হলো, যারা বলে মানুষ তার কাজে সম্পূর্ণ বাধ্য এবং যারা বলে মানুষের কাজে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষের কাজে যদি মানুষ বাধ্য হতো, তাহলে তার কোনো ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকতো না। অথচ আমরা বাস্তবে তার বিপরীত দেখি। সে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা কাজ করে। আল্লাহ তা'আলাও কুরআনে মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা সাব্যস্ত করেছেন। এই মর্মে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

আর যদি বলি মানুষের কাজে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন তাও ঠিক নয়। কারণ, তাই যদি হতো, তাহলে মানুষ যেটাই করার ইচ্ছা করে সেটাই করে ফেলতে পারতো। অথচ আমরা বাস্তবে দেখছি, মানুষ যার ইচ্ছা করে, তার সবই সে করতে পারে না।

অতএব, যারা বলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে বাধ্য, সে জাবরীয়া ফির্কার অনুসারী। জাবরীয়ারা বলে, বান্দার কাজে বান্দা সম্পূর্ণ বাধ্য এবং তারা বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

আর যারা বলে, বান্দার কাজে বান্দা পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন, তারা তাক্বদীর অস্বীকারকারী কাদারীয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কাদারীয়ারা বলে, বান্দার কাজ পূর্বে লিখা হয়নি; বরং বান্দা যখন কাজ করে তখন লিখা হয় এবং বান্দার কাজ বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে। সে তার ইচ্ছার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এমনকি তার কাজেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহলে বান্দা কি সম্পূর্ণ বাধ্য না সে তার ইচ্ছা ও কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন, -এই প্রশ্নের জবাব কী? এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার রাস্তাই বা কী?

জবাব হচ্ছে, উপরোক্ত উভয় মাযহাবের মাঝখানেই রয়েছে হক বা সঠিক মাযহাব এবং গোমরহীর মাঝেই রয়েছে হিদায়াত। আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করে আমি বলতে চাচ্ছি যে, মানুষ একদিক থেকে স্বাধীন আরেকদিক থেকে বাধ্য। মানুষ এই দিক থেকে স্বাধীন যে, তার ইচ্ছা রয়েছে। এর মাধ্যমে সে তার কাজ-কর্ম নির্বাচন ও বাছাই করতে পারে। তার ক্ষমতা রয়েছে। এর মাধ্যমে সে কাজ করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾

"এটি একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে"। (সূরা দাহর: ২৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ "তোমাদের স্ত্রীদের সাথে তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সহবাস করো"। (সূরা আল বাকারা: ২২৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ "যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক"। (সূরা কাহাফ: ২৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾

"কখনো নয়। এটি তো একটি উপদেশ। যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। এটি এমন সব কিতাবে লিখিত আছে, যা সম্মানিত উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র। এটি মর্যাদাবান ও পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে থাকে"। (সূরা আবাসা: ১১-১৬)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"তুমি এমন কাজে নিমগ্ন হও, যা তোমার উপকার করবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। অপারগ হয়ো না। তোমার কোনো বিপদ হলে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম! তাহলে এমন এমন হতো; বরং বলো এটাই আল্লাহর নির্ধারণ। তিনি যা চেয়েছেন করেছেন। কেননা যদি শব্দটি শয়তানের দুয়ারকে উন্মুক্ত করে।[৭৩]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ، قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

"তোমরা মাগরিবের পূর্বে ছ্বলাত আদায় করো, তোমরা মাগরিবের পূর্বে ছ্বলাত আদায় করো। তৃতীয়বার তিনি বললেন, তবে যে ইচ্ছা করে। মানুষ এটাকে সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করুক, তিনি এটা অপছন্দ করেছেন।[৭৪]

---

[৭৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪।

[৭৪] ছ্বহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১১৮৩।

আর মানুষ এই দিক থেকে বাধ্য যে, তার সমস্ত কাজ তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত। তার কোনো কাজই আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণের বাইরে নয়। বান্দা তার কাজ-কর্ম নির্ধারণে আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ "তিনিই তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে ভ্রমণ করান"। (সূরা ইউনূস: ২২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনিত করেন। এতে তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে তার অংশীদার বানায়, তিনি তার বহু উর্ধ্বে। (সূরা কাসাস: ৬৮)

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

"আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিখে দিয়েছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে"।[৭৫] এই অর্থে আরো অনেক দলীল রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এদু'টি জিনিসকে একসাথে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ মানুষ একদিক থেকে তার ইচ্ছায় স্বাধীন ও অন্যদিক থেকে বাধ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র। তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে ইচ্ছা করে তার জন্য। তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে কোনোই ইচ্ছা করতে পারো না"। (সূরা তাকবীর: ২৭-২৯)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য ইচ্ছা সাব্যস্ত করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন এবং আল্লাহর ইচ্ছার দ্বারাই বান্দার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়।

---

[৭৫] বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল কাদ্‌র।

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا منكم مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ وقد علم مَنزلهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

“তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়নি”।[৭৬] ছাহাবীগণ এটা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমরা কেন আমল করবো? আমরা কি আমাদের লিখার উপর নির্ভর করে বসে থাকবো না? তিনি বললেন, اعملوا فكل ميسر لما خلق له “তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেক মানুষকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই আমল সহজ করে দেয়া হবে। এই হাদীছে পূর্বোক্ত বিষয়ে দলীল রয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। কেননা তার যদি স্বাধীনতা না থাকতো, তিনি এটা বলতেন না যে, তোমরা কাজ করো। কেননা যার কাজ করার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা থাকে না, তাকে কাজ করার আদেশ দেয়া অনর্থক। সেই সঙ্গে হাদীছটি এটাও প্রমাণ করে যে, মানুষ তার ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় আল্লাহর ক্ষমতা ও নির্ধারণের বাইরে নয়। এই প্রমাণ মিলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীতে, তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই আমল সহজ করে দেয়া হবে।

এই ছিল উপরোক্ত মাসআলায় শরী‘আত ও বাস্তবতার দলীল-প্রমাণ। আশা করি উপরোক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে সুস্পষ্ট জবাব রয়েছে এবং দলীল সমূহের মধ্যে সমন্বয়ও বিদ্যমান রয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে প্রশ্নটি সংশোধন করা উচিত। মানুষ কি তার কাজে বাধ্য না স্বাধীন? এর বদলে প্রশ্নটি এভাবে করা উচিত, মানুষের ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও কাজ করার ক্ষমতা আছে কি না? উত্তর পূর্বের মতই। সংক্ষেপে আবার বলছি। মানুষের ইচ্ছা রয়েছে। এর মাধ্যমে সে তার কাজ-কর্ম ও উপকারী জিনিস বাছাই ও নির্বাচন করে। রয়েছে তার ক্ষমতা। এর মাধ্যমে সে তার কাজ সম্পন্ন করে। তবে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতাতেই তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাস্তবায়িত হয়।

এই ব্যাখ্যা থেকে ঐসব লেখকদের লিখা পরিষ্কারভাবে ভুল প্রমাণিত হলো, যারা তাক্বদীর সম্পর্কিত মাসআলা লিখার সময় এভাবে শুরু করে যে, মানুষ কি বাধ্য না স্বাধীন? অতঃপর তারা অত্যন্ত লম্বা জবাব দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো সঠিক ফলাফল বের করতে পারে না।

---

[৭৬] ছ্বহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১৩৬২।

তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, এভাবে বিস্তারিত জবাব ও ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়া তাক্বদীরের মাসআলা সম্ভব নয়। তাদের উচিত ছিল, তাক্বদীর সম্পর্কে লিখার আগে কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলোর আলোকে তাক্বদীরের বিষয়টি পরিষ্কার করা। ত্রুটিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা নয়। তাদের উচিত ছিল তাক্বদীরের চারটি স্তরসহ এ সম্পর্কিত আলোচনা সম্পন্ন করা। এটাও বর্ণনা করা দরকার ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন। বান্দার উপর আবশ্যক হলো তাক্বদীর ও শরী'আত উভয়টার উপর বিশ্বাস করা। আবশ্যক ছিল সংবাদগুলো বিশ্বাস করা এবং আদেশের আনুগত্য করা। সে যদি সৎকাজ করতে পারে, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। তাদের উপর এটাও বলা আবশ্যক ছিল যে, বান্দা তার দুনিয়ার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করবে এবং এ জন্য শরী'আত সম্মত বৈধ পন্থা অবলম্বন করবে। যদি তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর যদি উদ্দেশ্যের বিপরীত কিছু হয়, তাহলে তাক্বদীরের মাধ্যমে নিজেকে সান্তনা দিবে। তাক্বদীর সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার চেয়ে এটাই যথেষ্ট। আমরা যেভাবে আলোচনা করলাম, সেভাবে যদি কেউ তাক্বদীরের মাসআলা বুঝতে সক্ষম হয়, তাহলে সে নানা ধরণের সন্দেহ ও সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে, ইনশা-আল্লাহ।

কুরআনে এসেছে যে, মাতৃগর্ভে যা আছে, তা কেবল আল্লাহই জানেন। ঐ দিকে মেডিকেল সাইন্স মাতৃগর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে এটা জানতে সক্ষম হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হচ্ছে। এই সাংঘর্ষিক বিষয়টির মাঝে সমন্বয় হবে কীভাবে?

এই প্রশ্নটি হয়ে থাকে, যা অনেকের কাছেই বিষয়টি অস্পষ্ট। অনেকেই প্রশ্নটি এভাবে করে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু বলেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

"ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। গর্ভাশয়ে যা থাকে, তা তিনিই জানেন।[৭৭] কেউ জানে না, সে আগামীকাল

[৭৭] যদি প্রশ্ন করা হয় আজকাল ডাক্তারগণও তো বলে দিতে পারে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান আছে? না মেয়ে সন্তান? উত্তর হল সন্তানের গঠন পূর্ণ হওয়ার পরই ডাক্তারগণ যন্ত্রের সাহায্যে তা বলতে পারে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা বলতে পারে না। তাছাড়া ডাক্তারগণ শুধু ছেলে না মেয়ে এটি বলতে পারে। সন্তান সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগা হবে? তার

কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, সে কোন্ যমীনে মৃত্যু বরণ করবে" (সূরা লুকমান: ৩৪) এবং রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু বলেছেন, গায়েবের চাবি হচ্ছে পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এগুলো জানে না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ﴾

"ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। গর্ভাশয়ে যা থাকে, তা তিনিই জানেন। (সূরা লুকমান: ৩৪)

তাই আমরা কীভাবে এর মাঝে এবং মেডিকেল সাইন্স কর্তৃক মাতৃগভের সন্তান ছেলে না মেনে তা সনাক্ত করার মাঝে কীভাবে সমন্বয় করবো?

আল্লাহর অনুগ্রহে এই প্রশ্নের জবাব দেয়া খুব সহজ। তবে জবাব দেয়ার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা পরিষ্কার করা আবশ্যক। সেটি হচ্ছে, কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট বক্তব্য কখনো বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। বাস্তবে যদি এমন কিছু দেখা দেয়, যা বাহ্যিকভাবে কুরআনের বিপরীত, তা সম্ভবত নিছক দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়; আসলে সেটা বাস্তব নয়। আর না হয় কুরআনুল কারীম বাস্তবতার বিরোধিতায় সুস্পষ্ট নয়। কেননা কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং বাস্তব বিষয়, -উভয়টাই অকাট্য। দু'টি অকাট্য বিষয় কখনো পরস্পর সাংঘর্ষিক হতে পারে না। বর্তমান ও অতীতের আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তার কিতাব درء تعارض العقل والنقل নামক বিরাট কিতাবটি এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই রচনা করেছেন। শুধু শাইখুল ইসলামই নন; বরং অনেক পশ্চিমা নিরপেক্ষ লেখক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনুল কারীম ও আধুনিক বিজ্ঞান পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। ফরাসী লেখক মুরিস বুকাই তাওরাত, ইঞ্জিল, কুরআন ও বিজ্ঞান নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে বিদ্যমান বিকৃত তাওরাত ও বিকৃত ইঞ্জিল প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সেই সঙ্গে এই লেখক এমন অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা প্রমাণ করে যে, কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সাংঘষিক হওয়ার বহু উর্ধ্বে। কুরআন মেডিকেল সাইন্সের প্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত বিষয়ের বিপরীত

স্বভাব-চরিত্র ভালো হবে না মন্দ হবে? সে কি ধনী হবে না ফকীর হবে? এ সমস্ত বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মেঘ দেখে আমরা বলতে পারি বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বৃষ্টি হবেই, নিশ্চিতরূপে এ কথা কেউ বলতে পারে না।

নয়; বরং আধুনিক বিজ্ঞানে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে কুরআন বহু আগেই সংবাদ দিয়েছে। মোটকথা লেখক তার গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন কখনো মেডিকেল সাইন্স দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এর সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। অতএব যেহেতু সাব্যস্ত হয়ে গেলো যে, কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সাংঘর্ষিক নয়, তাই আমরা উপরোক্ত সমাস্যার সমাধানের দিকে যাচ্ছি।

(১) আমরা বলবো যে, মাতৃগর্ভে যা আছে, তা কেবল আল্লাহই জানেন, -এই জানাটা শুধু মাতৃগর্ভের সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে, -এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বিষয়টি আরো ব্যাপক। বরং সন্তানের গঠন পূর্ণ হওয়ার আগেই আল্লাহ জানেন যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে। আর মেডিকেল সাইন্স কেবল সন্তানের গঠন শেষ হওয়ার পরই জানতে পারে। আর আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে যা আছে তা জানেন, -এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা গর্ভস্থ সন্তানের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থা প্রতি মুহূর্তে জানেন। প্রতি মুহূর্তে সন্তানের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া কিংবা সংকোচিত হওয়া সম্পর্কে জানেন। সন্তানের দেহ গঠন হওয়ার আগেই তিনি সন্তানের সব অবস্থা জানেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা সন্তানের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানেন এবং ভবিবষ্যৎ প্রস্তুতি ও সফলতা-ব্যর্থতা সম্পর্কেও জানেন। এ সম্পর্কে মেডিকেল সাইন্স কিছুই বলতে পারে না। মাতৃগর্ভের সন্তান সম্পর্কে কেবল আল্লাহই জানেন, -এর মধ্যে সন্তানের রিযিকের বিষয়টিও রয়েছে। তার রিযিক কম হবে না বেশি হবে? রিযিকটা হালাল হবে না হারাম হবে? সন্তানের বয়সের বিষয়টিও রয়েছে এর মধ্যেই। বয়স কম হবে না বেশি হবে? সন্তান সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান হবে। মাতৃগর্ভে যা আছে এগুলোও তার মধ্যে গণ্য। এগুলো আল্লাহই জানেন। তিনি এগুলো কাউকে জানান না। তবে কোনো রাসূল বা ফেরেশতা বা অন্য কাউকে জানাতে চাইলে সে কথা ভিন্ন। আর আয়াতে এটা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, মাতৃগর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে, এটা তিনিই জানেন। হাদীছেও এটা পরিষ্কার করে বলা হয়নি।

(২) মাতৃগর্ভে যা আছে, তা ছেলে না মেয়ে, -এটা শুধু দেহ গঠন হওয়ার পরই জানা যায়। আর গঠনের পূর্বে যে সময় অতিক্রান্ত হয়, তাতে সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা জানা অসম্ভব। কেননা তা গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। আলেমদের ঐক্যমতে চার মাসের পূর্বে সন্তানের মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয় না। সন্তানের গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রূহ ফুঁকে দেয়া হয় না। সন্তানের গঠন পরিপূর্ণ হওয়ার পর বিষয়টি গায়েবের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কেননা গঠন পরিপূর্ণ হওয়ার পর দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পার্থিব জীবনের

বাহ্যিক ইলমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এটা মানুষ থেকে নাকচ করা হয়নি। বরং এটা তাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "তারা শুধু পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য জিনিসগুলো জানে"। (সূরা রূম: ৭)

সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মাতৃগর্ভে যা আছে, তা যেমন কেউ জানে না অনুরূপ শুক্রকীটের যেই অংশ দিয়ে সন্তান সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তাও কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন সন্তান ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়ার আদেশ দেন অথবা সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার আদেশ দেন, তখন এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতারা জানেন এবং যাদেরকে আল্লাহ জানাতে চান, তারাও জানে।[৭৮]

এটাই শরী'আত ও বাস্তবতার দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। শরী'আতের দলীলটি ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের সন্তানের ব্যাপারে একজন ফেরেশতাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ফেরেশতা বলে, হে আমার প্রভু! এটা তো শুক্রকীট মাত্র। অতঃপর বলে, হে আমার প্রভু! এটা তো জমাট রক্ত। অতঃপর বলে, হে আমার প্রভু! এটা তো মাংসপিন্ড। অতঃপর আল্লাহ যখন তা দ্বারা মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন ফেরেশতা বলে, হে আমার প্রভু! ছেলে হবে না মেয়ে? সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান? তার রিযিক কী পরিমাণ হবে? বয়স কত হবে? অতঃপর এগুলো মায়ের পেটেই লিখে দেয়া হয়। আর বাস্তবতার দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হলো, গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে, -দেহের গঠন পূর্ণ হওয়ার পর যন্ত্রের মাধ্যমে তা জানা সম্ভব।

তাক্বদীরের মাসআলা বুঝতে যারা ভুল করেছে

তাক্বদীরের মাসআলা বুঝতে গিয়ে অনেকেই বিরাট ভুলে নিপতিত হয়েছে। কিছু মানুষ ভুল করেছে তাদের তাক্বদীর সম্পর্কিত কথা-বার্তায়, কিছু লোক ভুল করেছে কাজ-কর্মে এবং কিছু লোক ভুল করেছে বিশ্বাসের মধ্যে। আবার কেউ ভুল করেছে কথায়, কাজে এবং বিশ্বাসে। এই ভুলগুলো নিম্নরূপ:

---

[৭৮] তাফসীর ইবনে কাছীর, (৩/৪৭৩)।

১) প্রথম ভুল: পাপাচারের উপর তাক্বদীরের দলীল: ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, মুছীবতের সময় তাক্বদীর দিয়ে দলীল দেয়া যাবে; পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নয়। কিন্তু মানব সমাজে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা পাপাচারে ডুবে থাকে এবং তাদের পাপাচারের বৈধতা আদায়ের জন্য কিংবা আনুগত্যের কাজ বর্জনের ক্ষেত্রে তাক্বদীরের দলীল পেশ করে। তাদের কাউকে যখন বলা হয়, ছ্বলাত আদায় করো না কেন? তারা বলে আল্লাহ আমার জন্য ছ্বলাত আদায়ের ইচ্ছা করেননি। তাই ছ্বলাত আদায় করি না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই ছ্বলাত আদায় করবো। তাদের কাউকে যখন বলা হয়, কখন তুমি তাওবা করবে? তখন সে বলে, যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন।

এটা মারাত্মক ভুল ও বিভ্রান্তি। যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, এটা দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য আল্লাহর পছন্দ ও ভালোবাসা তাহলে সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যারোপ করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যের কাজ পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকেন। তাই তিনি এর আদেশ দিয়েছেন ও শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন, -এটা দ্বারা যদি মাশীআত তথা আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা হয়, অর্থাৎ আল্লাহ আমার জন্য অমুক অমুক আনুগত্যের কাজ নির্ধারণ করেননি অথবা আমার জন্য অমুক অমুক পাপাচার নির্ধারণ করেছেন, তাহলে এটাও মারাত্মক ভুল। কেননা তাক্বদীরের বিষয়টা হচ্ছে লুকায়িত গোপন বিষয়। তা সংঘটিত হওয়ার আগে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তার ইচ্ছাটা আল্লাহর নির্ধারণ সম্পর্কে জানার ভিত্তিতে হয় না। অতএব, তার এই কথা বাতিল যে, আল্লাহ আমার জন্য অমুক পাপাচার নির্ধারণ করেছেন বা অমুক অন্যায়ের ইচ্ছা করেছেন, তাই আমি তা করছি। আর পাপাচারের উপর তাক্বদীরের দলীল পেশ করাও বাতিল। কেননা এতে ইলমুল গায়েবের দাবি করা হয়ে যায়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না। তাই তাদের দলীল বাতিল। মানুষ যা জানে না, তাতে তার দলীল-প্রমাণ অকার্যকর। ইতিপূর্বে পাপাচারের উপর তাক্বদীরের দলীল পেশ করার বিষয় বাতিল হওয়ার কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২) দ্বিতীয় ভুল: এই যুক্তিতে বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য না করা যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাদের উপর মুছীবত নেমে এসেছে: কিছু লোক আছে তাদের সামনেই তাদের মুসলিম ভাইয়েরা বিপদ-মুছীবত ও দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের উপর মেনে এসেছে ভয়াবহ দুর্যোগ। তারপরও তারা তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে না এবং তাদের সহাযোগিতার উদ্যোগ নেয় না। অন্যদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহও দেয় না। তাদের যুক্তি হলো, এটা

আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাদেরকে উদ্ধার করতে চান, তাহলে আমাদের সাহায্য ছাড়াই তাদেরকে উদ্ধার করবেন। এধরণের কথা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ বাতিল। এটা বিরাট মূর্খতার পরিচয়। কারণ, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া কিংবা আনুগত্য বর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছার দলীল অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি দুর্দশাগ্রস্তদেরকে সাহায্য করবেন, এই কথা আল্লাহর হিকমত সম্পর্কেও অজ্ঞতার পরিচয়। বিশেষ করে যেখানে আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো মানুষকে অন্যান্য মানুষের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকেন, একজনের মাধ্যমে অন্যজনকে পরীক্ষা করেন এবং একজনকে দিয়ে অন্যজনকে প্রতিহত করেন।

ধন-সম্পদ আল্লাহর মালিকানাধীন। ওহে যারা এই কথা বলছো, তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার কাছ থেকে ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারেন। তখন কি তুমি খুশি হবে? তখন যদি তুমি বিপদগ্রস্ত হও, তখন তোমাকে এটা বলা হলে কী তুমি পছন্দ করবে?

অতএব, এটা মারাত্মক ভুল ও বিভ্রান্তিকর কথা। যারা এটা বলে, তাদের মধ্যে ঐসব লোকের সাদৃশ্য রয়েছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"যখন ওদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছেন, তা থেকে খরচ করো, তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন, তাকে আমরা কেন খাওয়াবো? তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে রয়েছো"। (সূরা ইয়াসীন: ৪৭)

৩) তৃতীয় ভুল: আল্লাহর উপর ভরসা করার অযুহাত পেশ করে এবং আল্লাহর ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি নিজেকে সোপর্দ করে উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করা: অনেক মুসলিম আছে, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করার দোহাই দিয়ে এবং তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের অযুহাত পেশ করে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা বাদ দেয়। তাদের কথা হচ্ছে আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে। অতএব চেষ্টা ও পরিশ্রম করে লাভ নেই। আল্লাহ যখন চাইবেন, তখন মুসলিম জাতির বর্তমান বিপর্যয় ও দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করবেন। এটা আসলে ঐসব ছূফীদের অবস্থার মতই, যারা উপায়-উপকরণ অবলম্বন বর্জন করাকে সর্বোচ্চ তাওয়াক্কুল মনে করে।

এই মতবাদর্শ বর্তমানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এটা একটা ভয়াবহ বিপদে রূপ নিয়েছে। তারা প্রায় ভুলেই গেছে

যে, মুসলিম জাতি অতীতে অনেক দুর্যোগ পার করেছে এবং কঠিন মুহূর্ত অতিক্রম করেছে। কিন্তু তাতে জাতির আলেম ও শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ নিরব ও নিষ্ক্রিয় থাকেননি। তারা দুর্যোগ ও কঠিন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করেছেন। অতঃপর সঠিক পদক্ষেপ, গভীর দৃষ্টি ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং যথাযথ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে দুর্যোগের মোকাবেলা করে সফল হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে মুসলিম উম্মাহর উপর তাতার ও ক্রুসেডারদের আক্রমণের কথা বলা যেতে পারে। তারা মুসলিম জাতির প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলোকে সম্পূর্ণ তছনছ করে দিয়েছিল। কিন্তু জাতির সূর্যসন্তানগণ এটাকে তাক্বদীরের লিখা মুছীবত বলে মেনে নিয়ে বসে থাকেননি। জাতিকে তাতার ও ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করতে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে ময়দানে নেমেছেন। তারা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও সংগ্রাম করে অল্প সময়ের ব্যবধানে তাতার ও ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিয়েছেন। তারা জাতির হারানো মর্যাদা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করেছেন। যেমন ছিল স্বর্ণযুগের মুসলিমদের অবস্থা। আল্লাহর সাহায্য পেয়ে মুমিনগণ সেদিন খুশি হয়েছে। আমরা কী জাতির অতীত থেকে শিক্ষা নিবো না?

পরবর্তী যুগসমূহে জাহেলিয়াতের অন্ধকার মুসলিমদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মুসলিম সমাজে নাস্তিক্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শির্ক, বিদ'আত ও ধর্মীয় কুসংস্কারের ছয়লাব তো বয়েই চলছে। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে জাতির সূর্যসন্তান ও দায়িত্বশীলদের করণীয় কী? তারা কি আল্লাহ এবং তাক্বদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকবেন? জাতিকে এই দুর্যোগ থেকে মুক্ত করার বাস্তব ভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ না করে বসে থাকাটা জাতির সাথে বড় ধরণের খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে।

আজ যারা সঠিক ইসলামের দাবি করছে, তাদের মধ্যে না আছে সৎকাজের আদেশ, না আছে অসৎকাজের নিষেধ, না আছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, না আছে ইসলাম চর্চা ও প্রসারের আগ্রহ, না আছে মূর্খতা দূর করার পরিকল্পনা, না আছে ধ্বংসাত্মক মতাদর্শ ও বিভ্রান্তিকর রীতি-নীতি বিদূরীত করার উদ্যোগ। সম্ভবত এই বিশ্বাসেই সবকিছু বর্জন করা হচ্ছে যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে ও তিনি যা চাইবেন, তাই হবে!!

এটা একটা বিরাট মুছীবত, মারাত্মক গোমরাহী। এহেন চিন্তা জাতিকে অধঃপতনের অতল তলে নিয়ে গেছে, শত্রুদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে এবং

জাতির ভাগ্যকপালে একের পর মহা মুছীবত ডেকে এনেছে। জাতীয় জীবনে উন্নতির জন্য কাজ করা, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের পরিপন্থি নয়; বরং তাক্বদীরের প্রতি ঈমানেরই পরিপূরক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর অনেক কিছু নির্ধারণ করেছেন এবং আমাদের থেকে অনেক কিছু চেয়েছেন। আমাদের উপর যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তা আমরা জানি না। আর আমাদের থেকে যা কিছু চেয়েছেন, তা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছেন। আমাদের থেকে আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন বিশ্ববাসীর কাছে সত্যের দাওয়াত তুলে ধরি, যদিও তিনি জানেন যে, তারা ঈমান আনবে না এবং আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন, যদিও তিনি জানেন যে, আমরা জয়লাভ করবো না। তিনি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছেন, যদিও তিনি জানেন যে, আমরা দলে দলে বিভক্ত হবো এবং তিনি আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে নিজেদের মধ্যে দয়াশীল হতে বলেছেন, যদিও তিনি জানেন যে, আমাদের নিজেদের মধ্যেই হবে প্রচণ্ড মতভেদ।

আল্লাহ আমাদের জন্য যা চেয়েছেন এবং আমাদের থেকে যা চেয়েছেন এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ দু'টি জিনিসকে এক মনে করাই বিভ্রান্তির কারণ। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, সবকিছুর মালিকানা তাঁর হাতেই। আসমান-যমীনের চাবিকাঠি তারই হাতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির জন্য একটি নিয়ম-নীতি স্থির করেছেন। এই নিয়ম-নীতির ভিত্তিতেই সবকিছু পরিচালনা করেন। অথচ তিনি এসব রীতি-নীতি ভঙ্গ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এটা করেন না।

আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুমিনদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। এর অর্থ এটা নয় যে, তারা বসে থাকবে আর আল্লাহ তা'আলা চেষ্টা করা এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা ছাড়াই সাহায্য করবেন। কেননা উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা ব্যতীত সাহায্য আসা সাধারণত অসম্ভব। তবে তিনি উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা ব্যতীত সাহায্য পাঠাতে সক্ষম। কিন্তু এটাকে তিনি তাঁর নিয়মের মধ্যে রাখেননি যে, মাধ্যম গ্রহণ করা ছাড়াই তিনি বান্দাকে সাহায্য করবেন।

৪) তৃতীয় ভুলঃ এই অযুহাতে দু'আ বর্জন করা যে, দু'আ করার আগেই আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি চাইলে বান্দাকে চাওয়া ছাড়াই দিবেন এবং বান্দার জন্য যা কিছু লিখা হয়েছে, বান্দা এর বেশি কখনো পাবে নাঃ

এমন মানুষও রয়েছে, যারা দু'আর প্রতি মোটেই গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে দু'আ করার কোনো প্রয়োজন নেই। দু'আ করে কোনো লাভও নেই। বিশেষ করে যখন জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার অবস্থা জানেন এবং যখন জানা যাচ্ছে বান্দার জন্য যা কিছু নির্ধারিত আছে, তার বেশি সে কখনো পাবে না। যারা এহেন যুক্তিতে দু'আ করা বর্জন করে, তাদের কেউ কেউ বলেছে, বালা-মুছীবত নেমে আসার পর দু'আ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা বাতিল কথা। এটা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের সম্পূর্ণ পরিপন্থি এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাকে অকার্যকর করে দেয়ার নামান্তর। আর এমন একটি ইবাদত বর্জন করা, যা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ইবাদত বলে গণ্য।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ দু'আ তাক্বদীরকে পরিবর্তন করে।[৭৯] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ العَافِيَةَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ»

"যার জন্য দু'আ করার দরজা খুলে দেয়া হয়েছে, তার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে যা কিছু চাওয়া হয় এবং যা তিনি দান করেন তার মধ্যে সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাওয়াই তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আপতিত বালা-মুছীবত বিদূরীত করার ক্ষেত্রে এবং যে মুছীবত আপতিত হয়নি, তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে দু'আ খুবই উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দু'আ করো"।[৮০] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ لَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

তাক্বদীরের বিপদা-পদ থেকে সতর্কতা অবলম্বন উপকারী হয় না। আপতিত বালা-মুছীবত বিদূরীত করার ক্ষেত্রে এবং যে মুছীবত আপতিত হয়নি, তা

[৭৯] হাসান: সুনানে তিরমিযী হা/২১৩৯, মুসনাদ আহমাদ (৫/২৭৭)

[৮০] যঈফ: তিরমিযী, ৩৫৪৮, যঈফ জামি হা/৫৭২০।

থেকে নিজেকে বাঁচাতে দু'আ খুবই উপকারী। আর দু'আ ও বালা-মুছীবত ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংঘাতে লেগেই থাকবে।[৮১]

ছূফী তরীকার যেসব লোক দু'আ বর্জন করে, তারা একটি বাতিল হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে। তারা উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্বন্ধ করে বলে থাকে যে, তিনি বলেছেন, ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন রশি দিয়ে বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি নেয়া হলো, তখন তিনি এই দু'আটি বলেছেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ،

অতঃপর তারা যখন আগুনে নিক্ষেপ করলো, তখন জিবরীল ফেরেশতা এসে বলল, হে ইবরাহীম! তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি? তখন আল্লাহর নাবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, তোমার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। জিবরীল তখন বললেন, তাহলে তোমার রবের কাছে চাও। তিনি তখন বলেছিলেন, আমার রব আমার অবস্থা জানেন। প্রশ্ন করার বদলে তাঁর জানাটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

এটা বাতিল হাদীছ। এর কোনো ভিত্তি নেই। আলেমগণ এই হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর অসারতা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগবী সূরা আম্বীয়া এর তাফসীরে হাদীছটি দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৮২]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা: حَسْبِي مِنْ سؤالي علمه بحالي. "আমার রব আমার অবস্থা জানেন। প্রশ্ন করার বদলে তাঁর জানাটাই আমার জন্য যথেষ্ট", এটা বাতিল কথা। ইবরাহীম খলীল এবং অন্যান্য নাবীদের ব্যাপারে আল্লাহর তা'আলা যা উল্লেখ করেছেন, এটা তার বিপরীত। নাবীগণ আল্লাহর কাছে সবসময় দু'আ করতেন এবং তাঁর কাছেই চাইতেন। সেই সঙ্গে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি।[৮৩]

শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছ সম্পর্কে বলেন, এর কোনো ভিত্তি নেই। কোনো কোনো ছূফী এটাকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা

---

[৮১] তাবারানী, (২/৮০০)

[৮২] দেখুন মাআলিমুত তানযীল, (৫/৩৪৭)।

[৮৩] দেখুন, মাজমুআ ফাতাওয়া, (৮/৫৩৯)।

হিসেবে উল্লেখ করেছে। অথচ এটা ইসরাঈলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। মারফু হাদীছের মধ্যে এর কোনো ভিত্তি নেই।[৮৪]

ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এরপর হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, ছূফী তরীকায় যারা হিকমত নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের কেউ কেউ এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চাওয়া তাকে অপবাদ দেয়ার শামিল। অতঃপর ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ছূফীদের উক্ত কথার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। নাবীগণ কি তাদের প্রভুর কাছে বিভিন্ন জিনিস প্রার্থনা করার সময় তাঁকে অপবাদ দিয়েছেন? এটা নাবীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

৫) **পঞ্চম ভুল: এই দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার ফায়ছালা প্রতিরোধ কামনা করছি না; বরং তাতে তোমার দয়া প্রার্থনা করছি:** এরকম দু'আ মানুষের মুখে মুখে প্রায়ই শুনা যায়। এরকম দু'আ করা অনুচিত। কেননা তাক্বদীরের মধ্যে যদি অকল্যাণকর কিছু থাকে, তাহলে তাক্বদীরের ফায়ছালা পরিবর্তন চেয়ে দু'আ করা শরী'আত সম্মত। এই জন্যই ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এই মর্মে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء "যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যের কবল থেকে এবং তাক্বদীরের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং আল্লাহর বাণী:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢)﴾

"হে নাবী! বলো, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার। (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে"। সূরা ফালাক্ব: ১-২।

অতঃপর ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ উল্লেখ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»

"তোমরা আল্লাহর কাছে বালা-মুছীবতের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের কবল, তাক্বদীরের অনিষ্ট এবং শত্রুর উল্লাস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো"।[৮৫]

---

[৮৪] দেখুন, সিলসিলা যঈফা, (১/২৮)।

[৮৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৬১৬।

৬) **ষষ্ঠ ভুল: এই কথা বলা যে, সময় এটাই চেয়েছিল অথবা এই কথা বলা যে, তাক্বদীর এটাই চেয়েছিল:** এই কথাগুলো বলা সঠিক নয়। কেননা সময়ের কোনো ইচ্ছা নেই এবং তাক্বদীরের কোনো ইচ্ছা নেই। শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) কে এই শব্দগুলো বলার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছেন, তাক্বদীর এটা চেয়েছে, সময় এটা চেয়েছে, -এই শব্দগুলো ভালো নয়। কেননা সময়ের কোনো ইচ্ছা নেই এবং তাক্বদীরেরও কোনো ইচ্ছা নেই। আল্লাহই কেবল ইচ্ছা করেন। তবে কেউ যদি বলে, এটা আল্লাহর ফায়ছালার দাবি, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ইচ্ছাকে তাক্বদীরের প্রতি সম্বন্ধ করা বৈধ নয়। কেননা ইচ্ছা কেবল বিশেষিত সত্তারই হয়ে থাকে; বিশেষণের কোনো ইচ্ছা থাকে না।

৭) **সপ্তম ভুল: এই কথা বলা যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং অমুক ইচ্ছা করেন:** এভাবে বলা আল্লাহর সাথে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে 'এবং' শব্দ দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকে বান্দার ইচ্ছার সমান করে দেয়া হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি বান্দাকে আল্লাহর সমান করে দেয়, সে বান্দাকে আল্লাহর সাথে শরীক করে। যদিও তা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

সুনানে নাসাঈতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে আরো একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে বলল, ماشاء الله وشئت "আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন"। তিনি তখন বললেন, أجعلتنى لله ندا؟ "তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরীক বানিয়ে ফেললে?" আসলে আল্লাহ একাই যা ইচ্ছা করেছেন, তাই হয়েছে"।[৮৬] এই হাদীছ পূর্বে বর্ণিত বিষয়কেই সুস্পষ্ট করছে। এভাবে বলা শির্ক। কেননা واو দ্বারা আতফ করা হলে মাতুফ এবং মাতুফ আলাইহিকে সমান করে দেয়া হয়।[৮৭] কারণ, হরফুল আত্ফ واو কে গঠন করা হয়েছে দু'টি বিষয়কে একই হুকুমে একত্রিত করার জন্য। সুতরাং রুবুবীয়াত ও উলুহীয়াতের কোনো বিষয়েই মাখলুককে খালেকের মত করা যাবে না। যদিও সেটি খুব মামুলী বিষয় হয়। যেমন পূর্বে মাছির ঘটনায় এমন দুই

---

[৮৬] হাদীছটির একাধিক শাওয়াহেদ থাকার কারণে ছ্বহীহ। দেখুন: কুররাতুল উয়ুন, পৃষ্ঠা নং- ৩৪৭।

[৮৭] বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য আরো বলা যেতে পারে যে, دخل خالد وأحمد في الغرفة অর্থাৎ খালেদ এবং আহমাদ রুমে প্রবেশ করেছে। এ কথা তখনই এভাবে বলা যথার্থ হবে, যখন জানা যাবে যে, তারা উভয়েই একই সময় একই সাথে রুমে প্রবেশ করেছে।

ব্যক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, যাদের একজন মূর্তির জন্য মাছি উৎসর্গ করে জাহান্নামী হয়েছিল এবং অন্যজন মূর্তির জন্য মাছি পেশ করতে অস্বীকার করার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল।

উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণ মিলে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের চার দেয়ালের হেফাযত করেছেন। অর্থাৎ তাওহীদের সীমানা সংরক্ষণ করেছেন। যে সকল কথা ও কাজে শির্কের সম্ভাবনা রয়েছে তার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বৈপিত্রেয় ভাই তোফায়েল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, কয়েকজন ইহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা অবশ্যই একটা ভালো জাতি, যদি তোমরা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র না বলতে! তারা বলল, তোমরাও অবশ্যই একটি ভালো জাতি। যদি তোমরা ماشاء الله وشاء محمد আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন, এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর পুত্র'- এ কথা না বললে তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বলল, তোমরাও একটি ভালো জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা না বলতে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন। সকালে এ স্বপ্নের খবর যাকে পেলাম তাকে বললাম। তারপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম এবং তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন একটি কথা বলছ, যা থেকে আমিও তোমাদেরকে নিষেধ করতে চেয়েছিলাম, তবে অমুক অমুক কারণ আমাকে তা বলতে বাধা প্রদান করেছে। অতএব তোমরা এভাবে বলবে না যে, ماشاء الله وشاء محمد 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন; বরং তোমরা বল, ماشاء الله وحده আল্লাহ একাই যা ইচ্ছা করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আল্লাহ চেয়েছেন এবং অমুক ব্যক্তি চেয়েছেন, এটা বলা জায়েয নয়। তবে এটা বলা যাবে যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন। তবে এর চেয়েও উত্তম হচ্ছে, আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন। কেননা এতে সব দিক থেকেই শির্কের পরিপন্থি তাওহদীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি

তাওহীদ ও ইখলাসের ক্ষেত্রে পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকেই নিজের জন্য নির্বাচন করে থাকে।

৮) অষ্টম ভুল: ইনশা-আল্লাহ না বলে ভবিষ্যতে কোনো কাজ করবে বলে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করা কিংবা ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা ঘটবে বলে নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করা:

কেউ কেউ বলে, আমি অমুক দিন অমুক কাজ অবশ্যই করবো। কিন্তু ইনশা-আল্লাহ বলে না। এটা মারাত্মক ভুল। মুসলিমদের উচিত, এরকম ভুল পরিহার করে চলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

"কখনো তুমি কোনো বিষয়ে বলো না যে, আমি ওটা আগামীকাল করবো। তবে এটা বলে নিবে যে, যদি ইনশা-আল্লাহ চান"। (সূরা কাহাফ: ২৩-২৪) ইনশা-আল্লাহ বলা ব্যতীত যারা ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা অমুক দিনে ঘটবে বলে ঘোষণা দেয়, তাদেরকে আপনি আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত বাণী শুনিয়ে দিন।

৯) নবম ভুল: শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য, এই বিশ্বাস না থাকা কিংবা বিশ্বাসে দুর্বলতা থাকা: কেউ কেউ মুসলিমদের দুর্বলতা, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি দেখে এবং তাদের উপর ইসলামের শত্রুদের কর্তৃত্ব দেখে আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হয়ে যায়। ইসলামের শক্তি থেকে নিরাশ হয়ে যায়। মুসলিমদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে তারা অসম্ভব মনে করে। তারা আরো ভাবে যে, বাতিল হকের উপর সবসময় জয়ী থাকবে এবং বাতিলের মোকাবেলায় সত্য টিকে থাকতে না পেরে সত্যের আলো মিটে যাবে। এই ধারণা মারাত্মক ভুল। দুর্বল মুসলিমদের অন্তরেই কেবল এই ধারণা উদয় হয়। যার ঈমান ও ইয়াকীন দুর্বল হয়ে গেছে, কেবল সেই এই ধারণা পোষণ করতে পারে। তাদের ধারণা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থি। এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদার উপর তাদের আস্থা দুর্বল হওয়ার প্রমাণ। আসলে বাহ্যিক অবস্থার উপর দৃষ্টি না দিয়ে পরিণাম ও পরিণতির প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। শুভপরিণাম মুমিন ও মুত্তাকীদেরই হবে, -এই বিশ্বাস রাখা জরুরী।

মুমিন ও মুত্তাকীগণ বিজয়ী হবে না এবং তারা পুনঃরায় প্রতিষ্ঠিত হবে পারবে না ও বাতিলপন্থীরাই সবসময় বিজয়ী থাকবে, -এই বিশ্বাস কীভাবে করা যেতে পারে? অথচ আল্লাহ তা'আলা আদিতেই লিখে রেখেছেন যে, তাকওয়া ও মুত্তাকীদের পরিণামই শুভ হবে। আল্লাহর সৈনিকরাই জয়ী হবে, তারাই

সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।

যারা মনে করে, আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় কালামের সেই বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে বলেননি, যার প্রতি আরবী ভাষা সুস্পষ্ট নিদের্শনা প্রদান করে তারাও আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করল।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ব্যতীত সে এবং তার উস্তাদরাই সত্য বলেছেন এবং তাদের কথাতেই রয়েছে সুস্পষ্ট হিদায়াত ও আল্লাহর কালামের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের মধ্যে গোমরাহী ছাড়া অন্য কিছু নেই, তাদের ধারণা আল্লাহর প্রতি খুবই মন্দ। এদের সকলেই আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণকারী এবং আল্লাহর ব্যাপারে অন্যায় ও জাহেলিয়্যাতের ন্যায় ধারণা পোষণকারী।

এমনকি যে ধারণা করল যে, আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরেও অন্য কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এমন কিছু হয়ে থাকে, যা তিনি সৃষ্টি করতে ও গঠন করতে সক্ষম নন সেও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করল। যারা বিশ্বাস করল আল্লাহ্ তা'আলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মহীন ছিলেন, কোন কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষমও ছিলেন না, অতঃপর তিনি কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন, সেও আল্লাহর প্রতি খুব খারাপ বিশ্বাস পোষণ করল। যারা বিশ্বাস করল, আল্লাহ্ শুনেন না, দেখেনও না এবং সৃষ্টি সম্পর্কে অবগতও নন সেও আল্লাহর প্রতি খুব খারাপ ধারণা পোষণ করল। আর যারা মনে করে আল্লাহর কোন ইচ্ছা নেই, কথা বলাও তাঁর গুণের অন্তর্ভুক্ত নয়, তিনি কারও সাথে কথা বলেননি, বলবেনও না, কোন আদেশ বা নিষেধও করেননি, তারাও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করল।

এমনি যারা ধারণা করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহের উপর আরশে সমুন্নত নন, সকল স্থানই তাঁর জন্য সমান এবং যারা সুবহানা রাব্বীয়াল আ-লা আর সুবহানা রাব্বীয়াল আসফাল বলাকে একই রকম মনে করে তাদের আক্বীদাহ্ খুবই খারাপ। যারা মনে করে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরী পাপাচারিতা এবং অবাধ্যতাকে আনুগত্যের ন্যায়ই ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন তারাও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করল।

এমনি যারা বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ্ কাউকে ভালোবাসেন না, কারও প্রতি সন্তুষ্টও হন না, ক্রোধান্বিতও হন না, কাউকে বন্ধু হিসাবেও গ্রহণ করেন না, কাউকে দুশমন হিসাবেও গ্রহণ করেন না, তিনি কারও নিকটবর্তী হন না এবং অন্য কেউ তাঁর নিকটবর্তী হয় না, তারাও আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণকারী।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মনে করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়কে একইভাবে মূল্যায়ন করেন এবং সকল দিক থেকে সমান দু'টি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করেন (অর্থাৎ ন্যায় বিচার বর্জন করেন) কিংবা একটি মাত্র কবীরা গুনাহ্ এর কারণে সারা জীবনের সৎ আমল বরবাদ করে দেন এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী করেন, সেও আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করল।

সার কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যেই গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন অথবা আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য যে সমস্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কেউ যদি তার খেলাফ ধারণা পোষণ করে অথবা আল্লাহর গুণাবলীকে বাতিল বলে বিশ্বাস করে সেও আল্লাহর প্রতি খুব মন্দ ধারণা পোষণ করল।

এমনিভাবে যারা বিশ্বাস করল যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে অথবা তাঁর কোন শরীক আছে অথবা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীতই তাঁর কাছে কেউ সুপারিশ করতে পারবে অথবা আল্লাহর মাঝে এবং তাঁর মাঝে কোন মাধ্যম (মধ্যস্থতাকারী রয়েছে), যারা আল্লাহর কাছে মাখলুকের প্রয়োজন পেশ করে থাকে অথবা যে ধারণা করল যে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা আনুগত্যের মাধ্যমেও পাওয়া যাবে এবং নাফরমানীর মাধ্যমেও পাওয়া যাবে অথবা ধারণা করল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কাজ ছেড়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার বদলে অন্য কিছু দিবেন না অথবা ধারণা করল যে, পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই বিনা কারণে বান্দাকে শাস্তি দিবেন অথবা যে ব্যক্তি ধারণা করল যে, অন্তরে ভয় ও আশা নিয়ে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করলেও আল্লাহ্ তাকে নিরাশ করবেন অথবা ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শত্রুরা তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর পর সর্বদা বিজয়ী থাকবে, তারাও আল্লাহর প্রতি খুব মন্দ ধারণা পোষণ করল।

যারা ধারণা করল যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করার পর লোকেরা আহলে বাইতের উপর জুলুম করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, আল্লাহর দুশমন এবং আহলে বাইতের দুশমনদের বিজয় হয়েছে, অথচ আল্লাহ্ আহলে বাইতকে সাহায্য করার ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে সাহায্য করেননি এবং যারা ধারণা করে যে, যারা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অছীয়তকে পরিবর্তন করেছে, তাদেরকেই (আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)) তাঁর পাশে কবর দেয়া হয়েছে আর উম্মাতে মুহাম্মাদী তাঁর উপর এবং তাদের উপর সালাম পেশ করছে, তারা কাফের ও বাতিলপন্থী এবং আল্লাহর প্রতি খুবই

খারাপ ধারণা পোষণকারী। কারণ আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা কুফরীরই নামান্তর।

সুতরাং অধিকাংশ লোকই আল্লাহর প্রতি অন্যায় ও খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন সেই কেবল বাঁচতে পেরেছে। মানুষ মনে করে তাকে স্বীয় হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, অথবা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। সে মনে করে, আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন, সে তার চেয়ে আরও বেশী পাওয়ার হকদার ছিল, মুখে উচ্চারণ না করলেও তার অবস্থার ভাষা বলছে, আমার রব আমার উপর জুলুম করেছেন, আমার অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন, তার নফস্ এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যদিও তার জবান তা অস্বীকার করছে। কেননা সে তা খোলাখুলি উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছে না। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের নফসের মধ্যে অনুসন্ধান চালাবে, সে তাতে এই কথার সত্যতা খুঁজে পাবে। এই ধারণাটি তার মধ্যে সেভাবেই লুকিয়ে থাকে যেমন আগুন দিয়াশলাইয়ের মধ্যে লুকায়িত থাকে। সুতরাং তুমি যদি এ কথার সত্যতা যাচাই করতে চাও, তাহলে কারও দিয়াশলাইয়ে আঘাত করে দেখ (কোন মানুষকে পরীক্ষা করে দেখ)। অচিরেই সে তার ভিতরের অবস্থা কিছু হলেও প্রকাশ করে দিবে। তুমি দেখবে, সে তার তাক্বদীরের উপর আপত্তি উত্থাপন করছে, স্বীয় তাক্বদীরকে দোষারোপ করছে এবং তাক্বদীরে যা লিখিত হয়েছে, তার বিপরীত প্রস্তাব করছে। কেউ কম করছে আবার কেউ বেশী করছে। প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ নফ্সের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং আত্মসমালোচনা করা। সে এই রোগ থেকে মুক্ত কি না? কবির ভাষায় বলতে গেলে,

فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة + وإلا فإني لا إخالك ناجيا

"হে বন্ধু! তুমি যদি এ থেকে (তাক্বদীরের উপর আপত্তি করা থেকে) মুক্ত হয়ে থাক তাহলে জেনে রাখ তুমি বিরাট একটি মুছীবত থেকে মুক্তি পেলে। এ থেকে মুক্তি না পেলে তুমি নাজাত পাবে বলে আমার মনে হয় না।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই উচিত নিজ নিজ আত্মার খবর নেওয়া, আত্মাকে উপদেশ দেয়া এবং প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিনি যেন তাকে তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত রাখেন এবং সেই অনুযায়ী সৎ আমল করার তাওফীক দেন। আমীন।

১০) দশম ভুলঃ ভবিষ্যত কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে জানার জন্য জ্যোতিষ ও গণকদের কাছে যাওয়াঃ গণক ও জ্যোতিষদের কাছে যাওয়া,

তাদের কাছে ভবিষ্যতের খবর জানতে চাওয়া, তাদের কথা গ্রহণ করা এবং তাদের সংবাদ বিশ্বাস করা তাক্বদীরের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিভ্রান্তির অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাক্বদীরের বিষয়টি গায়েবের মধ্যে গণ্য। গায়েবের ইলম একমাত্র আল্লাহর নিকটেই।

১১) এগারোতম ভুল: কারো ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে শপথ করে এই কথা বলা যে, "আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না কিংবা অমুক ব্যক্তি সাফল্য লাভ করতে পারবে না": কিছু কিছু ভালো লোককেই এই ধরণের কথা বলতে শুনা যায়। কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা নিজেরা সৎ আমল করার পাশাপাশি অন্যদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিতে আগ্রহী। তারা কবীরা গুনাহ, যুলুম ইত্যাদিতে লিপ্তদেরকে তাওবা করার আহব্বান জানায় এবং সৎ আমল করার উৎসাহ দেয়। কিন্তু তারা যখন বিভ্রান্তদেরকে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের কাজে অবিচল দেখে এবং সৎকাজে এগিয়ে আসার পরিবর্তে অন্যায়ের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ও নছীহত প্রত্যাখ্যান করতে দেখে, তখন নিরাশ হয়ে যায়। কখনো কখনো দৃঢ়তার সাথে একথাও বলে ফেলে যে, আল্লাহ তোমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এই কথা খুবই মারাত্মক। এর ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে। তার এই কথা আমল নষ্ট হওয়ার কারণ। এই ধরণের কথা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের পরিপন্থি। কেননা হিদায়াত আল্লাহর হাতে এবং কারো শেষ পরিণামের ইলমও আল্লাহর নিকটেই। কে এই ব্যক্তিকে জানালো যে, আল্লাহ অমুক লোককে কখনো ক্ষমা করবেন না? কে তাকে আল্লাহর রহমতকে সীমাবদ্ধ করার অধিকার দিলো?

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সুনানের "যুলুম থেকে নিষেধ" নামক অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«كَانَ رَجُلاَنِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ وَ لاَ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِى قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ»

"বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ভাই বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের একজন সবসময় পাপ কাজে লিপ্ত হতো আর অন্যজন সবসময় ইবাদত-

বন্দেগীতে লেগে থাকতো। ইবাদত-বন্দেগীতে লেগে থাকা লোকটি তার ভাইকে সবসময় পাপ কাজে লিপ্ত হতে দেখতো আর বলতো, পাপ কাজ হতে বিরত থাকো! অতঃপর ইবাদত গোজার লোকটি একদিন তার ভাইকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে বলল, বিরত হও! এতে পাপ কাজে লিপ্ত লোকটি বলল, আমার প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি! আমাকে তুমি আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়েছে? এতে ইবাদত গোজার লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে কখনই ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতেও স্থান দিবেন না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের রূহ কবয করে নিলেন। তারা উভয়েই আল্লাহর নিকট হাজির হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা এই ইবাদত গোজারকে বললেন, তুমি কি আমার সব কিছুই জানতে কিংবা যা কিছু আমার হাতে আছে, তার উপর কী তুমি সক্ষম ছিলে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গুনাহগারকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও এবং আমার রহমতের ফলে জান্নাতে প্রবেশ করো। আর সৎ আমলকারীর ব্যাপারে তিনি বললেন, একে জাহান্নামে নিয়ে যাও।[৮৮]

১২) বারোতম ভুল: তাক্বদীরের উপর আপত্তি উত্থাপন করা: তাক্বদীরের উপর আপত্তি উত্থাপনকারীর সংখ্যা প্রচুর। অল্প মানুষই তাক্বদীরের ক্ষেত্রে নিজেকে আল্লাহর উপর সমর্পন করে ও তাক্বদীরের বিপদাপদ সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়। বিভিন্নভাবে মানুষ তাক্বদীরের উপর আপত্তি করে থাকে। মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ বলে, হে আল্লাহ! হে আমার প্রভু! আমি কী অপরাধ করলাম? আমি কি এটা পাওয়ার অধিকারী নই? আমি এমন কী অপরাধ করেছি, যাতে তুমি আমাকে এই বিপদে ফেললে? .....ইত্যাদি।

লোকেরা কাউকে মুছীবতে আক্রান্ত দেখে আরো বলে থাকে, অমুক লোকটি অসহায়। আসলে লোকটি এতবড় বিপদে পড়ার উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তার উপর অবিচার করেছেন। তাক্বদীর তার উপর যুলুম ও কঠোরতা করেছে। এরকম কথা মানুষের মুখে অনেক শোনা যায়। এ জাতীয় কথা আল্লাহর ফায়ছালা ও তাক্বদীরের উপর আপত্তি করার অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার হিকমত সম্পর্কে না জানার কারণেই এ জাতীয় কথা মানুষ বলে থাকে। অতএব, এ জাতীয় কথা বলা অবৈধ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাছ থেকে যা নিয়ে নেন, তা আল্লাহরই মালিকানাধীন। তিনি যা

---

[৮৮] হাদীছটি হাসান, দেখুন: আবু দাউদ, হা/৪৯০১। শাওয়াহেদ থাকার কারণে তথা একাধিক উৎস থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীছটি ছহীহ। দেখুন তিরমিযী, হা/২৩১৯।

বান্দাকে দেন, তাও তাঁরই। তাঁর শরী'আত, সৃষ্টি ও কাজের মধ্যে রয়েছে বিরাট হিকমত। বিষয়টি এ রকম যে, ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ "তাঁর কাজের জন্য কারো সামনে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে"?

১৩) তেরোতম ভুল: মুছীবত নেমে আসার সময় 'যদি' শব্দটি উচ্চারণ করা: মুছীবতে পড়ে অনেক মানুষ এই শব্দটি বারবার ব্যবহার করে। ধন-সম্পদের ক্ষতি, ফসলের ক্ষতি, নফসের ক্ষতি অথবা অন্যান্য ক্ষতি ও কষ্টের মধ্যে পড়ে মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিরক্ত ও অস্থির হয়ে অনেক মানুষ শব্দটি উচ্চারণ করে। তারা বলে, যদি এরূপ করতাম, এটা করতাম, ওটা করতাম, তাহলে এরকম হতো, ওরকম হতো, আমি এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতাম না। দুর্বল ঈমান ও আক্বীদাহর লোকেরাই এ রকম কথা বলে থাকে। একথাটি মারাত্মক ক্ষতিকর। এটা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও বিবেক-বুদ্ধির ঘাটতির পরিচয়। কেননা মুছীবতের সময় বান্দাকে ছ্বর করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে ও তাওবা করতে বলা হয়েছে। ঐ দিকে 'যদি' শব্দটি উচ্চারণ করার মাধ্যমে বান্দার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। এটা তাওহীদের পরিপন্থি কথা। এতে রয়েছে তাক্বদীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব। যারা 'যদি' শব্দটি ব্যবহার করে, তারা তাক্বদীরের বিরোধীতায় লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়। তবে আল্লাহ তাঁর নিজ ইচ্ছায় যাকে রক্ষা করবেন, সেই কেবল রক্ষা পাবে। অতএব, সকল মুসলিমের এই শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের এই কথাগুলোর নিন্দা করেছেন। তাদের কথাগুলো আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখে করেছেন। তারা বলে,

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا

"আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না"। (সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪) তারা আরো বলেছল,

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

"যারা ঘরে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলতো, তারা আমাদের কথা মত চললে নিহত হতো না"। আল্লাহ তাদের কথার জবাবে বলেন,

﴿قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾

“তাদেরকে বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো।”। (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৬৮)

আমাদেরকে আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যখন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করবো এবং আমরা আমাদের জন্য উপকারী বিষয় অর্জনের জন্য পরিশ্রম করবো, তখন যদি আমাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত কিছু দেখতে পাই, তখন আমাদের কেউ যেন এটা না বলে যে,

لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

“তোমার কোনো বিপদ হলে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম! বরং বলো এটাই আল্লাহর নির্ধারণ। তিনি যা চেয়েছেন করেছেন।[৮৯]

উপরের হাদীছে ইসলামী শরী‘আতের কিছু পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলামী শরী‘আত মুসলিমদেরকে দুঃখ-বেদনার সময় ভেঙে পড়া থেকে সতর্ক করে এবং অতীতের মুছীবত বারবার স্মরণ করা থেকে নিষেধ করে। কেননা অতীতের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হওয়াতে কোনো লাভ নেই। এর পরিবর্তে ইসলামী শরী‘আত মুসলিমদেরকে উপকারী ও উত্তম কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলে এবং তাক্বদীরের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকে সান্তনা নেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যত জীবনে উপকারী কাজে ব্যস্ত হওয়ার আহব্বান জানায়।

১৪) চৌদ্দতম ভুল: এমন কিছু কাজ করা, যা তাক্বদীরের বিরোধীতার শামিল: কিছু কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা মুছীবতের সময় শরীরের জামা-কাপড় ছিড়ে, গালে ও বুকে চাপড়ায়, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে, মাথার চুল ছিড়ে ও কামিয়ে ফেলে, ধ্বংস কামনা করে এবং এমনি আরো অনেক কাজ করে, যা জাহেলী যুগের নিকৃষ্ট কাজের মতই এবং যেগুলো তাক্বদীরের প্রতি ঈমান ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

১৫) পনেরোতম ভুল হিংসা: হিংসা একটি কঠিন ব্যাধি ও প্রাণ নাশক বিষ। মহান আল্লাহ যাকে এটা থেকে রক্ষা করেছেন, কেবল সেই রক্ষা

[৮৯] ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৬৪।

পেয়েছে।

আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে: لايخلو جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه "কোন মানুষের দেহই হিংসা থেকে মুক্ত নয়। দুষ্টলোক এটা প্রকাশ করে এবং ভদ্রলোক তা গোপন রাখে"।

নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিয়ামতের ধ্বংস কামনা করার নামই হিংসা। যে এটা করে তাকে হিংসুক বলা হয়। হিংসুকের এই স্বভাবটা আসলে আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালাকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। কেননা সে আল্লাহর নির্ধারণ ও ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না এবং তাঁর তাক্বদীরকে মাথা পেতে মেনে নেয় না। আসলে সে যেন বলতে চায়, অমুক ব্যক্তি পাওয়ার যোগ্য নয়। অথচ সে এত বড় নিয়ামত ও সম্পদ পেয়েছে। আর আমি তার চেয়ে অধিক যোগ্য। তারপরও আমাকে এটা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তার অবস্থা দেখে মনে হয় যে, সে নিজেই আল্লাহর রহমত মানুষের মধ্যে বন্টন করবে, সে যেন আল্লাহর কাছে তার প্রস্তাব পেশ করছে এবং নিজের হিংসাভিত্তিক পছন্দকে আল্লাহর উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সে তার আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার হিকমতকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টিকেই যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি বস্তুকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করেছেন। তাক্বদীরের প্রতি পূর্ণ ঈমানের দাবি হচ্ছে হিংসা বর্জন করা এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর উপর সমর্পন করা। সত্যিকার মুমিন মানুষের প্রতি হিংসা করে না। আল্লাহ মানুষকে যত সম্পদই দেন না কেন, তাতে প্রকৃত মুসলিম তার মনের মধ্যে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখে না। কেননা তার গভীর বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহই রিযিক বণ্টনকারী। তিনিই তাদের মাঝে জীবনোপকরণ ভাগ করেছেন। তাঁর হিকমতের দাবি অনুযায়ী তিনি যাকে ইচ্ছা দিয়েছেন এবং যাকে ইচ্ছা দেননি। হিংসুক যখন অন্যকে হিংসা করে, তখন সে যেন আল্লাহর বন্টন ব্যবস্থার উপর আপত্তি উত্থাপন করে। এই জন্যই আরবী প্রবাদের মধ্যে আছে যে, **من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد** "যে ব্যক্তি আল্লাহ ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে কেউ তাকে ঘৃণা করে না। আর যে ব্যক্তি তার রিযিক নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকে, তার অন্তরে হিংসা প্রবেশ করে না।

১৬) ষোলোতম ভুল: মৃত্যু কামনা করা: এমন মানুষও আছে, যারা মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে তাতে ছ্বর করতে না পেরে মৃত্যু কামনা করে। তারা ধারণা করে, মৃত্যুই মুছীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। এদের কেউ কেউ বলেছে, **ألا موت يباع فأشتريه + فهذا العيش لا خير فيه** "আমি

যদি শুনতাম যে, মৃত্যু বিক্রি হচ্ছে, তাহলে তা ক্রয় করতাম। এ জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই"। এ জাতীয় কথা মারাত্মক ভুল। কোনো মুমিনের জন্য মৃত্যু কামনা করা বৈধ নয়। কেউ যদি মৃত্যু কামনা করতে বাধ্য হয়, তাহলে সে যেন হাদীছে বর্ণিত দু'আটি পড়ে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».

তোমাদের কেউ যেন কোন মুছীবতে পড়ে মৃত্যু কামনা না করে। সে যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায় তাহলে সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্ আমাকে জীবিত রাখো যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আমাকে মৃত্যু দান করো।[৯০]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে আস-সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, বান্দার উপর যেসব বিপদাপদ ও মুছীবত নাযিল হয়, তাতে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেই মুছীবত রোগ-ব্যাধি হোক, দারিদ্র হোক, ভয় হোক কিংবা অন্য কোনো কঠিন বিষয় হোক। এসবের কোনো একটিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কামনা অবৈধ। কেননা মৃত্যু কামনার মধ্যে অনেক ক্ষতি রয়েছে। যেমন:

(১) যে বিপদে সে আক্রান্ত হয়েছে, মৃত্যু কামনা করার মাধ্যমে তার প্রতি বান্দার বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশিত হয়। অথচ তাকে মুছীবতে ছ্বর করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তার করণীয় কাজ করতে বলা হয়েছে। মৃত্যু কামনা করা ছ্বর ও ধৈর্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

(২) এটা মানুষের মন দুর্বল করে দেয়, তার শরীর ভেঙে যায়, মানুষকে অলস করে ফেলে এবং হতাশা ও নৈরাশ্যের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের উচিত এসব জিনিসের মোকাবেলা করা ও সাধ্য অনুযায়ী এগুলোকে পরাজিত করা ও হালকা করার চেষ্টা করা। সেই সঙ্গে সে বিপদাপদ ও কষ্ট বিদূরিত হওয়ার মনোবল ও আশা পোষণ করবে। এতে দু'টি লাভ রয়েছে। এক হচ্ছে মুছীবতে পড়ে যে ব্যক্তি তাঁর প্রভুর আদিষ্ট উপায়-উপকরণ অবলম্বন করবে, সে তার রবের দয়া-অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য ও সৌভাগ্যবান হবে। দ্বিতীয়ত তার প্রচেষ্টা তার অন্তরে শক্তি যোগাবে এবং আল্লাহর প্রতি তার হৃদয়কে আশান্বিত করবে।

---

[৯০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৭১।

(৩) মুছীবতে মৃত্যু কামনা করা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুছীবতে মৃত্যু কামনাকারী এক কষ্ট থেকে বাঁচতে গিয়ে তার চেয়ে বেশি কষ্টেও পড়ে যেতে পারে। যেমন কবর ও বারযাখী জীবনের শাস্তি।

(৪) মৃত্যু মানুষের সৎ আমলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। মানুষ যেসব ভালো কাজ করতে থাকে, তা সম্পন্ন করার আগেই মৃত্যু এসে গেলে, তা আর পূর্ণ করতে পারে না। মানুষের আমল বিহীন জীবনের কোনো মূল্য নেই। মানুষের ক্ষুদ্র একটি আমল দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়েও উত্তম।[৯১] অতএব নির্বোধ ও মূর্খ ব্যতীত অন্য কেউ আমলের সুযোগ নষ্ট হওয়ার কামনা করতে পারে না।

১৭) সতেরতম ভুলঃ আত্মহত্যার চেষ্টা করাঃ তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের মধ্যে মানুষ যেসব মারাত্মক ভুল করে থাকে, তা হচ্ছে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। কিছু মানুষ আছে, তারা দুঃখ-কষ্টে আপতিত হয়ে পৃথিবী সুবিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিজের সামনে একেবারে সংকীর্ণ মনে করে। বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো রাস্তা খুঁজে পায় না। তখন সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হয়। এর মাধ্যমে সে দুনিয়ার ঝামেলা ও বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ কামনা করে এবং দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে আরামের আশা করে। এই কাজ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ আত্মহত্যা এমন কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, এ থেকে সতর্ক করেছেন এবং যারা এটা করবে, তাদেরকে কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। তবে পারস্পরিক রেযামন্দির ভিত্তিতে যদি ব্যবসার মাধ্যমে হয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ

[৯১] বাহজাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা নং-২৫১-২৫২।

তোমাদের প্রতি মেহেরবান। যে ব্যক্তি অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন বশত এটা করবে, আমি অচিরেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর এটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ"। (সূরা আন নিসা ৪: ২৯-৩০)

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে দুনিয়ার কষ্ট থেকে আরাম পাওয়ার জন্য কোনো কোনো মানুষ আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হয়। কে তাকে সংবাদ দিলো যে, এতে কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে? কে তাকে জানালো যে, এতেই রয়েছে তার আরাম? আসলে এহেন ব্যক্তি যদি তার পরিকল্পনা পরিবর্তন না করে ও তাওবা না তাহলে তার জন্য উপরের আয়াতের কঠিন শাস্তি প্রতিক্ষারত।

১৮) আঠারোতম ভুল: কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় অসন্তুষ্ট হওয়া: কতিপয় মুসলিম আছে, যারা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে অসন্তুষ্ট হয় এবং কন্যা সন্তানের আগমনে মন খারাপ করে ও কষ্ট পায়। এটা জাহেলী যুগের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত এবং জাহেলী সমাজের মানুষের কঠোর স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাতে তাদের অনেক তিরষ্কার করা হয়েছে।

বর্তমানেও অনেক মুসলিম দেশে জাহেলী যুগের সেই নিকৃষ্ট স্বভাব বিদ্যমান। আপনি যদি এমন কোনো পুরুষের দিকে দৃষ্টি দেন, যার সদ্য কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তার চেহারায় জাহেলী সমাজের লোকদের ছাপ দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন কন্যা সন্তানের পিতা হওয়াতে তার চেহারায় মলিনতা, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তার লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٥٩﴾

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে হয় দুঃখভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ গোত্র হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যে সিদ্বান্ত নেয়, তা কতই না নিকৃষ্ট"। (সূরা আন নাহাল ১৬:৫৮-৫৯)

কন্যা সন্তান জন্ম নিলে অসন্তুষ্ট হওয়ার আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, কিছু কিছু গর্ভবতী মহিলাকে যখন হাসপাতালে পরীক্ষা করার পর মহিলার পেটে কন্যা সন্তান সনাক্ত করা হয়, তখন সংবাদ গোপন রাখা হয়। আর যখন ছেলে

সন্তান সনাক্ত হয়, তখন আনন্দের সাথে সেই সুসংবাদ প্রচার করা হয়। বিষয়টি খুবই মারাত্মক। এতে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে।

(১) এতে আল্লাহর নির্ধারণ ও ফায়ছালার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা হয়।

(২) এতে আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির আশঙ্কাও রয়েছে।

(৩) এটা মূর্খতা ও অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও বিবেকের স্বল্পতার পরিচয়।

(৪) এতে জাহেলী সমাজের লোকদের সাদৃশ্য বিদ্যমান।[৯২]

অতএব মুসলিমদের উচিত এই পথ পরিহার করা এবং ধ্বংসাত্মক কাজ পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা ও নির্ধারণের প্রতি নিজেকে সমর্পন করা ওয়াজিব। তাতে রাযী- খুশি থাকা প্রকৃত মুমিনের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

মেয়ে সন্তান প্রতিপালন করার ফযীলত কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। মেয়েরাই আমাদের মা, তারা আমাদের বোন, তারাই আমাদের স্ত্রী। তারা সমাজের অর্ধেক। আর বাকী অর্ধেকের তারাই জন্মদাতা। বলতে গেলে মানব সমাজের পুরোটাই তারা। মেয়েদের ফযীলত হচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহর দান বলা হয়েছে। আল্লাহ মেয়েদেরকে তাঁর দান বলেছেন। কুরআনে কন্যা সন্তানদেরকে ছেলেদের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ﴾

"তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন"। (সূরা আশ শূরা ৪২:৪৯)

রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা সন্তানদের ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার উৎসাহ দিয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

[৯২] তুহফাতুল মাওদূদ, পৃষ্ঠা নং- ১৬।

"দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার নিকট একজন মহিলা সাহায্য চাইতে আসল। কিন্তু আমার নিকট মাত্র একটি খেঁজুর ছাড়া আর কিছুই পেলনা। আমি খেঁজুরটিই তাকে দিলাম। সে তার দু'টি সন্তানের মধ্যে খেঁজুরটি ভাগ করে দিল। তা থেকে সে নিজে কিছুই খেল না। তারপর সে বের হয়ে গেল। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রবেশ করলেন তখন আমি তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের কারণে কোন প্রকার কষ্টের শিকার হবে তার জন্য কন্যারা দোযখের আগুন থেকে পর্দাস্বরূপ হয়ে যাবে। অর্থাৎ কন্যাদের লালন-পালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন"।[৯৩]

তাক্বদীরের মাসআলায় বিভ্রান্তির সূচনা

উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বপ্রথম তাক্বদীর অস্বীকারকারী:

ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা একটি সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত বিষয়। জাহেলী ও ইসলামী যুগের আরবের কোনো লোকই তাক্বদীর অস্বীকার করেনি। মুসলিম বিশ্বে যখন গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের কিতাবগুলো প্রবেশ করেছে, তখনই কাদারীয়া সম্প্রদায়ের বিদ'আত প্রকাশিত হয়েছে। কাদারীয়াদের শির্কই ইসলামে অনুপ্রবেশকারী সর্বপ্রথম শির্ক। ইরাকের বসরা ও সিরিয়ার দামেস্ক নগরীতেই এটা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। মক্কা ও মদীনাতে ইলম চর্চার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার কারণে এ নগরী দু'টিতে কাদারীয়াদের বিদ'আত প্রবেশ করতে পারেনি। তবে ছাহাবীদের শেষ যুগে যেমন ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের যুগে মক্কা ও মদীনাতে তাদের বিদ'আত প্রবেশ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে বসরার একজন লোক তাক্বদীর অস্বীকার করে। লোকটি বসরার একটি মুদীর দোকানে কাজ করতো। তার নাম ছিল সানসুওয়াই। তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মা'বাদ আল-জুহানী। জুহানী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে গায়লান আদ-দামেস্কী।

ইমাম আওযাঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইরাকে সর্বপ্রথম যে লোকটি তাক্বদীর অস্বীকার করে, তার নাম সুসান। সে ছিল প্রথমে খ্রিষ্টান। পরবর্তীতে সে ইলাম কবুল করে। অতঃপর সে আবার খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তার থেকে মা'বাদ

[৯৩] মুখতাসার ছ্বহীহ বুখারী, হাদীছ নং- ৭০৫।

আল-জুহানী এই মাযহাব শিখে নেয়। আর তার থেকে শিখে নেয় গায়লান।[৯৪]

মা'বাদ আল-জুহানী বসরায় বসবাস করতে থাকে। আর গায়লান থাকতো দামেস্কে। তাদের উভয়ের অবস্থা এক রকম ছিল না। মা'বাদের কাছে ইলম ছিল। ইহুদীরা সত্য জানার পরও তা না মানার কারণে আল্লাহর ক্রোধের স্বীকার হয়েছিল, মা'বাদও ছিল তাদের মত আল্লাহর ক্রোধপ্রাপ্ত। আর গায়লানের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, সে আলেম ছিল না। সে আলেম না হওয়া সত্ত্বেও এই মাসআলাটি শিখতে সক্ষম হয় এবং বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। অতঃপর সে তার গোমরাহী প্রচার করতে থাকে। ফলে সে খ্রিষ্টানদের মতই বিভ্রান্ত হয়েছে। শুরুর দিকে তাদের সন্দেহ ছিল, আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করলে মানুষের সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য দেয়া হয়ে যায়। তাই তারা আল্লাহকে মানুষের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দোষ থেকে পবিত্র করার জন্য আল্লাহর সব ছিফাত অস্বীকার করেছে। অতঃপর তাদের সন্দেহ হলো, আল্লাহ পাপাচারের স্রষ্টা হলে এবং বান্দা সেই পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দিলে আল্লাহ তা'আলার জন্য যুলুম সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হয়। তাই তারা আল্লাহকে পাপ কাজ সৃষ্টি করা থেকে পবিত্র রাখতে চেয়েছে। এতে করে তারা তাক্বদীর অস্বীকার করার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে।

সেই সময় জীবিত ছাহাবীগণ তাক্বদীর অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদ করেছেন। তাদের প্রতিবাদগুলো ছিল খুবই কঠিন ভাষায়। ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক এবং জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছেন।

গায়লান আদ-দিমাস্কী এবং মা'বাদ আল-জুহানীর পরে মুতাযেলাদের আবির্ভাব হয়। আসলে মুতাযেলাদের মাযহাব কাদারীয়াদের থেকে গৃহীত হয়েছে। ওয়াসেল ইবনে আতা, আমর ইবনে উবাইদ মুতাযেলাদের নেতা। এরা কাদারীয়াদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের মাযহাব প্রচার করতে থাকে। আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ তাক্বদীর অস্বীকারকারী এই গোমরাহ ফির্কাকে কাদারীয়া নামে নামকরণ করেছেন। তাদেরকে এই উম্মাতের অগ্নিপূজকও বলা হয়েছে। কেননা মাজুসী বা অগ্নিপূজকরা দু'টি মূলনীতিতে বিশ্বাস করে। একটি হচ্ছে আলো আরেকটি অন্ধকার। তারা বলে সৃষ্টিজগতের দু'টি মাবুদ রয়েছে। একটি আলো অন্যটি অন্ধকার। তারা আলোকে কল্যাণের স্রষ্টা আর অন্ধকারকে মন্দের স্রষ্টা মনে করে।

---

[৯৪] আশ-শরীআ লিল আজেরী, পৃষ্ঠা নং- ২৪৩।

কাদারীয়ারা তাদের মতই। তারা মনে করে মানুষই তার কর্মের স্রষ্টা। তারা বলে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি আর মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। এভাবে তারা দুই স্রষ্টা সাব্যস্ত করেছে। দুই স্রষ্টা নয়; বরং তারা বহু স্রষ্টা সাব্যস্ত করেছে। তারা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বহু স্রষ্টা সাব্যস্ত করেছে। এর মাধ্যমে তারা অগ্নিপূজকদের সদৃশ হয়েছে। কাদারীয়াদের মধ্যে এক শ্রেণির লোক আল্লাহর "ইলম" ছিফাতকে অস্বীকার করেছে। তাদের কথা হচ্ছে, আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন না। বান্দা কাজ করার আগে আল্লাহ বান্দার ব্যাপারে কোনো জ্ঞান রাখেন না। বান্দা যখন কাজ করে, আল্লাহ কেবল তখনই জানতে পারেন।

কাদারীয়াদের মাযহাবে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের বিপরীত আরেকটি ফির্কার আবির্ভাব হয়েছে। এরা তাক্বদীর সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে অতি বাড়াবাড়ি করেছে। বনী উমাইয়্যার শাসনামলের শেষের দিকে একটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে, যারা মনে করেছে যে, বান্দা তার কাজে সম্পূর্ণ বাধ্য। সে যা করে বা বর্জন করে, তাতে তার কোনো ইচ্ছা থাকে না। তাদের কেউ কেউ বান্দার জন্য এমন একটি ক্ষমতা সাব্যস্ত করেছে, যা আসলে তার কাজের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না।

এই নিকৃষ্ট কথা যে বের করে, সে হচ্ছে জাহাম ইবনে সাফওয়ান। জাহমীয়াদের বিদ'আত থেকে আরো অনেক নিকৃষ্ট মাযহাব ও বিরাট গোমরাহী আত্মপ্রকাশ করেছে।

তাক্বদীরের ব্যাপারে কিছু ভ্রান্ত ফির্কার পরিচয়

তাক্বদীরকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষ গোমরাহ হয়েছে। যারা এই বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা শরী'আতের দলীলের উপর বিবেক-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়ার কারণেই বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা কানাচোখে শরী'আতের দলীলগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে। যে দলীলগুলো তাদের প্রবৃত্তির মোতাবেক হয়েছে, সেগুলো তারা গ্রহণ করেছে এবং সেগুলো ছাড়া বাকীগুলোর ক্ষেত্রে তারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে। আমরা এই কিতাবে এই ফির্কাগুলোর বিস্তারিত প্রতিবাদ করবো না এবং তাদের সবগুলো কথা পর্যালোচনা করবো না। ইতিপূর্বে তাদের যেসব কথা আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে, সেগুলোই প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট।

তাক্বদীরের মাসআলায় যেসব ফির্কা বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদের কতিপয় নিম্নরূপঃ

(১) কাদারীয়া সম্প্রদায়ঃ এরা হচ্ছে মা'বাদ আল-জুহানী, গায়লান আদ-দিমাস্কী, ওয়াসেল ইবনে আতা এবং আমর ইবনে উবাইদের অনুসারী। তাদের কথা হচ্ছে বান্দা নিজের ইচ্ছাতেই কাজ করে এবং কাজের ক্ষেত্রে তার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে। তাদের কাজে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকে না। বান্দার কাজে আল্লাহর ইচ্ছার কোনো প্রভাব থাকে না। তারা আরো বলে, বান্দার কাজ আল্লাহর সৃষ্টি নয়। বান্দারাই তাদের কর্মের স্রষ্টা। তারা বলে বান্দার পাপাচার ও কুফরী আল্লাহর ইচ্ছাধীন নয়।

আর কাদারীয়াদের মধ্যে যারা চরমপন্থী, তারা আল্লাহ তা'আলার "ইলম" ছিফাতকেও অস্বীকার করে। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। এমনকি বান্দা কাজ করার পূর্বে আল্লাহ বান্দার কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানতেও পারেন না। সবকিছুই যে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন, -এটা তারা অস্বীকার করে এবং সবকিছুর উপরই যে আল্লাহর ক্ষমতা, এটাকেও তারা অস্বীকার করে। এই জন্যই এদেরকে অগ্নিপূজক বলা হয়। কেননা তারা অগ্নিপূজকদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যারা বলে, সৃষ্টি জগতের দু'টি মাবুদ রয়েছে। একটি আলোর আরেকটি অন্ধকারের। আলোর মাবুদ কল্যাণের স্রষ্টা আর অন্ধকারের মাবুদ অকল্যাণের স্রষ্টা। অতএব, কাদারীয়ারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে একাধিক শরীক সাব্যস্ত করে। তারা বলে, বান্দারাই তাদের কাজ সৃষ্টি করে। তারা তাদের কথার পক্ষে কিছু আয়াত দিয়ে একচোখা দলীলও পেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ "যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক"। (সূরা কাহাফ: ২৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়। আর তোমরা ইচ্ছা করলেই সত্য সরল পথে চলতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদেরকে সরল পথে চালানোর ইচ্ছা করেন"।[৯৫] সূরা আত তাকভীর ৮১:২৮-২৯

[৯৫] অর্থাৎ তোমরা সরল পথে চলতে চাইলেই হবে না এবং তোমরা ইচ্ছা করলেই হিদায়াতের পথ এখতিয়ার করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার তাওফীক তোমাদের সহায়ক হয়। তোমাদের ইচ্ছার সাথে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং তাঁর

শুরুতে এই শ্রেণির লোকদের গোমরাহীর উৎপত্তিটা এভাবে হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর প্রতি মন্দের সম্বন্ধ হওয়া থেকে নিজেদেরক পবিত্র রাখতে চেয়েছিল। এটাই তাদেরকে তাক্বদীর অস্বীকার করার দিকে নিয়ে গেছে। তাক্বদীরের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর সম্পর্কে আলোচনা করার সময়, বান্দার কাজ-কর্ম সৃষ্টি করা সম্পর্কিত আলোচনার সময় এ সংক্রান্ত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। আরো অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তাক্বদীরের প্রতি ঈমান বান্দার নির্বাচিত কাজে বান্দার স্বাধীনতা থাকার পরিপন্থি নয়। অকল্যাণ সৃষ্টি করা, তার মধ্যকার হিকমত, পাপাচার সৃষ্টি করা ও তা নির্ধারণ করার মধ্যে কী হিকমত নিহিত রয়েছে, তা আলোচনা করার সময় কাদারীয়া সম্প্রদায়ের জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের জবাবে এই আয়াতটিই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ "অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আস সাফ্ফাত: ৯৬)

২) **জাবরীয়া সম্প্রদায়:** এই সম্প্রদায় তাক্বদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা প্রকৃত অর্থে বান্দার কোনো কাজ থাকাও অস্বীকার করেছে। তাদের ধারণায় বান্দার কোনো স্বাধীনতা কিংবা কাজ নেই। বাতাসের সাথে তুলা যেমন উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তুলার কোনো স্বাধীনতা নেই এবং গাছের পাতা নড়াচড়া করার ক্ষেত্রে যেমন পাতার কোনো ইচ্ছা ও ক্ষমতা নেই, তেমন মানুষের কাজগুলোতে মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা নেই। আল্লাহর ইচ্ছাতেই তার সবকিছু হয়। বান্দার কাজগুলো কেবল রূপকার্থেই বান্দার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়; প্রকৃত অর্থে নয়। তাদের মতে যখন বলা হয়, মানুষ ছ্বলাত আদায় করেছে, ছিয়াম রেখেছে, হত্যা করেছে এসব কথা আসলে সেরকমই যেমন বলা হয়, সূর্য উঠেছে, বাতাস প্রবাহিত হয়েছে, বৃষ্টি নেমেছে। সূর্যের প্রতি যেমন উদিত হওয়ার সম্বন্ধ করা হয়, বৃষ্টির প্রতি যেমন নামার সম্বন্ধ করা হয়, বাতাসের প্রতি যেমন প্রবাহিত হওয়ার সম্বন্ধ করা হয়, ঠিক তেমনি মানুষের কাজগুলো রূপকার্থে মানুষের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। এতে তারা আল্লাহকে যুলুমের

তাওফীক এসে শামিল না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের পক্ষে সোজা পথে চলা সম্ভব নয়। সূরা কাসাসের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই বলেছেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন"।

অপবাদ দিয়ে ফেলেছে এবং বান্দাকে এমন কাজের আদেশ দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে ফেলেছে, যাতে বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই। তাদের কথা থেকে বান্দাকে এমন কাজের কারণে পুরস্কার দেয়া কিংবা শাস্তি দেয়া আবশ্যক হয়, যা আসলে বান্দার কাজ নয়। বান্দাকে শরী'আতের আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে অনর্থক কাজ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। তারা আদেশ ও নিষেধের হিকমতকেও বাতিল করে দিয়েছে। তাদের ফায়ছালা কতই না নিকৃষ্ট।

এই সম্প্রদায় মনে করে বান্দার কাজের প্রকৃত কর্তা আল্লাহ। তারা এই ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিপরীত। আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি বান্দার স্রষ্টা। বান্দার কাজেরও স্রষ্টা। আর বান্দা তার কাজের কর্তা। বান্দা যেহেতু তার কাজের কর্তা, তাই তার ভালো কাজের বিনিময় সে নিজেই পাবে এবং তার মন্দ কাজের শাস্তি সে নিজেই আস্বাদন করবে।

এই জাবরীয়াদেরকে মুশরিক কাদারীয়া বলা হয়। কারণ তারা জাহেলী যামানার মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাদের কথা জাহেলী যুগের মুশরিকদের কথার সাথে মিলে যায়। জাহেলী যামানার মুশরিকদের কথা ব্যক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ نَّحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁকে ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না"। সূরা আন নাহালের ১৬:৩৫

জাবরীয়াদের কথা মুশরিকদের কথার মতই বাতিল। ইতিপূর্বে তাদের কথার জবাব অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে আমরা বলেছি যে, তাক্বদীরের প্রতি ঈমান বান্দার নিজস্ব কাজে তার ইচ্ছা থাকার পরিপন্থি নয়। তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সময়ও তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৩) সীমালঙ্ঘনকারী ছূফীগণ: তাক্বদীরের মাসআলায় আরো যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের মধ্যে ছূফীদের একটি দল রয়েছে। এরা হলো ছূফীবাদে চরম বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকারী দল। এরা সৃষ্টির হাকীকত প্রত্যক্ষ করার মর্যাদা অর্জন করা ও রুবুবীয়াতের স্তরে উন্নীত হওয়ার দাবি করে। এরা

তাক্বদীর সাব্যস্ত করতে এত বাড়াবাড়ি করে যে, তারা মনে করে, বান্দার কাজের মধ্যে যেসব অন্যায় কাজ রয়েছে যেমন যুলুম, কুফুরী, পাপাচার, এসবই আনুগত্যের কাজ। কেননা এগুলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, তাক্বদীর ও নির্ধারণ অনুসারেই হয়ে থাকে। তাদের মতে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন ও যা কিছু নির্ধারণ করেছেন তার সবই তাঁর নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। বান্দা যদিও এসব হারাম ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে শরী'আতের আদেশের বিরোধিতা করে, কিন্তু সে আল্লাহর ইচ্ছারই আনুগত্য করে এবং তাঁর ইচ্ছাটাই বাস্তবায়ন করে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর তাক্বদীর ও ফায়ছালার আনুগত্য করে সে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্যকারীর মতই। উভয়েই আল্লাহর ইবাদতের হক আদায়কারী বলে গণ্য হবে।

তাই পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে কোনো প্রকার তিরস্কার করা হবে না এবং পাপাচারীকে দোষারোপও করা হবে না। বরং সমস্ত অপরাধীই তার কাজের মাধ্যমে যেহেতু তার প্রভুর ইচ্ছাকেই বাস্তবায়ন করে, তাই সে আনুগত্যকারী হিসেবেই গণ্য হবে। তারা তাদের কথার মাধ্যমে ফেরআউন, বাছুর পূজারী, ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের জন্যও ঈমান সাব্যস্ত করেছে। এটি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মাযহাব। যারা এই পথের পথিক, তাদের কাফের হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং এরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাফের।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে পাপাচারে লিপ্ত হয়, সমস্ত মাখলুকের সর্বব্যবস্থাপনা, কর্তৃত্ব, পরিচালনা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করার দাবি করে, তারা হালাল-হারাম, মুমিন-কাফের আনুগত্যশীল ও পাপাচারীর মধ্যে পার্থক্য করে না, তারা আসলে কোনো রাসূলের প্রতিই বিশ্বাসী নয় এবং আসমানী কোনো কিতাবেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা আদম ও ইবলীসের মর্যাদা সমান সমান করে, নূহ অলাইহিস সালাম ও তার কাফের জাতিকে একই রকম মনে করে এবং উম্মতের প্রথম যুগের অগ্রবর্তী মুসলিম ও মক্কার মুশরিকদেরকে সমমর্যাদাবান মনে করে।

৪) দার্শনিকগণ: দার্শনিকরা মনে করে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের ছোট ছোট জিনিসগুলো সম্পর্কে জানেন না। বরং তিনি কেবল মৌলিক জিনিসগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানেন। তাদের কথার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কিছুই জানেন না।[৯৬] কেননা সৃষ্টিজগতের মধ্যে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা'আলার সত্তার বাইরে যা কিছু আছে, তার সবই গৌণ, ক্ষুদ্র

[৯৬] শরহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসেতীয়া, খলীল হাররাস, পৃষ্ঠা নং- ৯৪।

ও আংশিক। অথচ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মধ্যে সব একই রকম। তিনি বড় বড় ও মৌলিক জিনিসগুলো সম্পর্কে যেমন ইলম রাখেন, ছোট ছোট জিনিস সম্পর্কে তেমনই জানেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়, জল ভাগের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি শস্য দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। "তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়কাল পূর্ণ হয়। অবশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কী আমল করছিলে"। (সূরা আল আন-আম ৬:৫৯-৬০)

৫) আশায়েরা সম্প্রদায়: আশায়েরা ফির্কার লোকেরা জাবরীয়া ও কাদারীয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদার মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে। কাদারীয়াদের মতে বান্দার কাজ বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে এবং নিজেই করে। জাবরীয়ারা বলে বান্দার কাজ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তা'আলাই বান্দার কাজের কর্তা। এই মাযহাব দু'টি পরস্পর সাংঘর্ষিক। আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মাযহাব দু'টির মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে এবং উভয় মাযহাবের মাঝখানে الكسب (অর্জন) নামে একটি মতাবাদ বের করেছে। এর অর্থ হচ্ছে বান্দা আসলে তার কাজের কর্তা নয়; বরং كاسب অর্থাৎ অর্জনকারী। আসলে তাদের এই মতাবাদটি ঘুরেফিরে জাবরীয়াদের কথার মতই। কেননা এতেও বান্দার কাজে তার ক্ষমতা ও প্রভাব থাকাকে নাকচ করা হয়েছে। আসলে আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদেরকে বুঝাবে তো দূরের কথা, তারা নিজেরাই তা বুঝতে পারেনি।

৬) রাফেযী সম্প্রদায়: তাক্বদীরের মাসআলায় আরো যারা গোমরাহ হয়েছে, তাদের মধ্যে শিয়া (রাফেযী) সম্প্রদায় অন্যতম। তাদের মতে আল্লাহ তা'আলার البداء 'বাদা' হয়। তাদের মতে 'বাদা' অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রথমত অজ্ঞ থাকেন। অতঃপর তিনি তা জানতে পারেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেন। কখনো কখনো তিনি এমন জিনিস জানতে পেরে অবাক হন, যা পূর্বে জানতেন না। অথবা তিনি যা জানতেন তার বিপরীত হতে দেখে আশ্চর্যবোধ করেন। নাউযুবিল্লাহ

শিয়াদের রাফেযী সম্প্রদায় বলে, তাদের ইমামগণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু জানেন। ইমামদের নিকট সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই অজানা নয়। তারা কখন মারা যাবেন, তাও জানেন। তারা নিজেদের ইচ্ছাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাদের কাছে আসমান-যমীনের সব ইলম রয়েছে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে যা কিছু আছে তাও তারা জানেন। তারা মানুষের কাছে ঈমান ও নিফাকের হাকীকত বর্ণনা করে থাকেন এবং তাদের হাতে এমন একটি কিতাব রয়েছে, যাতে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের নাম লিখা আছে। এমনকি কারা শিয়াদের বন্ধু এবং কারা তাদের দুশমন তার তালিকা তাদের ইমামদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন, শিয়া ও সুন্নাহ, ইহসান ইলাহী যহীর, পৃষ্ঠা নং ৬৩)

রাফেযীদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি হওয়ার আগে সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারেন না। তাদের কেউ কেউ বলেন, সৃষ্টিজগতের মূল মূল বিষয়গুলো জানেন; অংশগুলো বাস্তব রূপ ধারণ করার আগে জানতে পারেন না।

এসবই তাক্বদীরের মাসআলার বিভ্রান্তির অন্তর্ভুক্ত। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রথম স্তর হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন ইলমে বিশ্বাস করা। আর তারা এটাই অস্বীকার করে বসেছে। তাদের কথা কীভাবে সঠিক হতে পারে? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়, জল ভাগের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তাঁর অবগতি

ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি শস্য দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে"। (সূরা আল আন-আম ৬:৫৯)

৭) আসমানের তারকা ও কক্ষপথের প্রভাবে বিশ্বাসী সম্প্রদায়: তাক্বদীরের মাসআলায় আরেকটি সম্প্রদায় হচ্ছে, যারা তারকারাজিতে দৃষ্টি দেয়। এর মাধ্যমে তারা তাক্বদীরের গোপন বিষয় জানার দাবি করে। তারা বলে, অমুক অমুক তারকা উদিত হওয়া বা চলাচলের সময় যার জন্ম হয়, তার অমুক অমুক দিনে এমন এমন হয়ে থাকে। তাদের কেউ বলে, তোমার নাম থেকে তোমার ভাগ্যে কী আছে, তা জানা সম্ভব। তোমার জন্মের মাস থেকেই তোমার ভাগ্য জানা সম্ভব। এসব কথা অযথা বকবকানি আর গায়েব সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান করে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাক্বদীরের মাসআলায় যারা বিভ্রান্ত তারা ব্যতীত অন্য কেউ এই ধরণের কথা বলতে পারে না। কেননা তাক্বদীরের বিষয়টা সম্পূর্ণ গায়েব। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না।

কাদারীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের কিছু ঘটনা ও তাদের সাথে কিছু কথোপকথন

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তাক্বদীরের প্রতি ঈমান বান্দার তাওহীদকে সুশৃঙ্খল করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি এবং শরী'আতের বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান সাব্যস্ত হয়েছে। এতে যারা আহলে সুন্নাতের বিরোধিতা করবে, তারা পরাজিত হবে, তাদের যুক্তি-তর্ক বাতিল গণ্য হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমদের সামনে তারা দলীল-প্রমাণ নিয়ে দাঁড়াবে তো দূরের কথা, একজন মূর্খ লোকের সামনেও তারা টিকতে পারবে না। আমরা এখানে এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করবো, যাতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাক্বদীরের ব্যাপারে সালাফদের মাযহাবই সঠিক।

বর্ণিত আছে যে, তাক্বদীরে অবিশ্বাসী মুতাযেলী ইমাম আমর ইবনে উবাইদ একদা ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছিল। তখন একজন গ্রাম্য লোক এসে বলল, হে লোক সকল! আমার উট চুরি হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে আপনারা দু'আ করুন, তিনি যেন আমার উটটি আমার কাছে ফিরিয়ে দেন। আমর ইবনে উবাইদ তখন বলল, হে আল্লাহ! তুমি চাওনি যে, তার উট চুরি

হোক। তারপরও চুরি হয়েছে। এখন তুমি তার উটটি ফিরিয়ে দাও। এতে গ্রাম্য লোকটি বলল, আমার জন্য তোমার দু'আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমর ইবনে উবাইদ বলল, কেন? গ্রাম্য লোকটি বলল, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যেহেতু চুরি হয়েছে, তাই এখন তিনি ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেও সম্ভবত ফিরিয়ে দিতে পারবেন না!![৯৭]

মুতাযেলী ইমাম কাযী আব্দুল জাব্বার আল-হামদানী সাহেব ইবনে আব্বাতের মজলিসে প্রবেশ করলো। তখন সেখানে আহলুস সুন্নাতের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু ইসহাক ইসফারাইনী উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুন্নী মাযহাবের লোকদের উস্তাদ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুতাযেলী ইমাম আব্দুল জব্বার উস্তাদ ইসফারাইনীকে দেখেই বলতে লাগলা, سبحان من تنزه عن الفحشاء "আমি ঐ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে পবিত্র। এই কথার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যে ছিল, অশ্লীল ও পাপাচার তার ইচ্ছায় হয় না। এমনকি পাপাচার ও অশ্লীলতা তিনি সৃষ্টিও করেন না। নাউযুবিল্লাহ।

সুন্নী ইমাম আবু ইসহাক মুতাযেলী ইমামের চালাকী ধরে ফেলেন এবং সাথে সাথে তিনি বলতে লাগলেন, سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء "আমি ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যার রাজত্বে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না এবং যার রাজ্যের মধ্যে তাঁর সৃষ্টি ছাড়া আর কারো সৃষ্টি নেই।

কাযী আব্দুল জাব্বার তখন বললো, আমাদের রব কি ইচ্ছা করেন যে, তাঁকে অমান্য করা হোক? আবু ইসহাক বললেন, আমাদের রবকে জোরপূর্বক পরাস্ত করে কি তাকে অমান্য করা হয়? অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্বে কি আল্লাহকে পরাজিত করে পাপাচার সংঘটিত হয়? কাযী আব্দুল জাব্বার তখন বলল, তুমি কি মনে করো, আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন এবং আমার জন্য মন্দের ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী হবেন না কি যুলুমকারী হবেন? আবু ইসহাক তখন বললেন, তিনি যদি তোমাকে এমন জিনিস থেকে মাহরুম করেন, যা তোমার নিজের হক, তাহলে অবশ্যই তিনি যুলুমকারী হবেন। আর যদি তাঁর মালিকানাধীন কোনো জিনিস তোমাকে না দেন, তাহলে তাঁর রহমত যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন। এতে তাঁর উপর কারো আপত্তি করার থাকে না। এতে মুতাযেলী ইমাম আব্দুল জাব্বার কোনো জবাব না দিতে পেরে পরাজিত হলো। তথাপিও সে তার ভ্রান্ত মাযহাবের উপরই রয়ে গেলো।[৯৮]

---

[৯৭] দেখুন: শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং ২৫০-২৫১।

[৯৮] দেখুন: শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়ার টিকা, পৃষ্ঠা নং ২৫১।

শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে নাসির আস-সা'দী আ-দুররা আল-বাহিয়াতে এমনি কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, যা তাক্বদীরের মাসআলাকে খোলাসা করে দেয়। সেগুলো থেকে একটি ঘটনা হচ্ছে, জাবরীয়া মতাদর্শের এক জ্ঞানী লোক তাক্বদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করতো। সে তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে ছোট-বড় সব অপরাধে লিপ্ত হতো। কোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজেই সে তোয়াক্কা করতো না। এমনকি সে মদপান ও যেনা-ব্যভিচারের মত নোংরা কাজেও লিপ্ত হতো। তাকে যখনই পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে দোষারোপ করা হতো তখনই সে তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করতো।

তার একজন ভালো বন্ধু ছিলো। সেই বন্ধু তাকে এভাবে তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে দোষারোপ করতো। কারণ, এটা বিবেক-বুদ্ধি ও শরী'আতের দলীলের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কিন্তু সে তার বন্ধুর নছীহতে মোটেই কর্ণপাত করতো না। তারপরও বন্ধু তাকে নছীহত করতেই থাকতো। বন্ধু এমন একটি সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, যাতে তাক্বদীরের দলীল দিয়ে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অযৌক্তিকতা ও অবাস্তবতা প্রমাণ করা যায় এবং তার নিজের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয় দিয়েই যেন তাকে বুঝানো যায়।

তাক্বদীরের দোহাই দিয়ে পাপাচারে লিপ্ত এই লোকটি ছিল বিরাট ধনী। তার ছিল বিভিন্ন শ্রেণির সম্পদ। ধন-সম্পদগুলো দেখাশুনার দায়িত্ব সে বিভিন্ন মানুষকে দিয়ে রেখেছিল এবং তার কর্মচারীও ছিল অনেক। আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প দিনের ব্যবধানে তার ধন-সম্পদের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হলো। একদিন তার পশুপালের দায়িত্বে নিয়োজিত রাখাল এসে বললো, সমস্ত গবাদি পশু ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে গেছে এবং সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কারণ, এগুলো এমন চারণভূমিতে চরানো হয়েছে, যেখানে সবুজ ঘাস ছিল খুব কম। এতে লোকটি রাখালের উপর রাগান্বিত হলো এবং তাকে দোষারেপ করতে লাগলো।

লোকটি রাখালকে বলতো লাগলো, তুমি যেহেতু জানতে পেরেছো সেখানে সবুজ ঘাস নেই, তারপরও পশুগুলো সেখানে চরাতে গেলে কেন? এতে রাখাল বলল, এটাই ছিল তাক্বদীর ও আল্লাহর ফায়ছালা। এই কথা শুনে রাখালের উপর তার রাগ আরো বেড়ে গেলো। রাগে সে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো।

কয়েকদিন পরেই তার ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী এসে বললো, আপনার বাণিজ্যিক কাফেলা ডাকাত দলের আক্রমণের স্বীকার

হয়েছে এবং সমস্ত মালামাল লুটপাট হয়ে গেছে। কারণ, আমি এমন এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যেটা ছিল ভীতিকর। সেটা ছিলো এমন পথ, যেখানে চোর-ডাকাতদের ওৎপাত খুব বেশি। এটা শুনে লোকটি বলল, তুমি যেহেতু জেনেছো, এই রাস্তাটি আশঙ্কাজনক ও চোর-ডাকাতে ভরপুর, তারপরও তুমি মালামাল নিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে গেলে কেন? কেন তুমি অন্য একটি নিরাপদ রাস্তা অবলম্বন করলে না? কর্মচারী রাখালের মতই জবাব দিলো। সে বলল, সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তাই হয়েছে। এটাই ছিলো তাক্বদীর। এতে লোকটি তার উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলো এবং কর্মচারীর এই অযুহাতে সে মোটেই কর্ণপাত করলো না।

এর কয়েকদিন পর তার সন্তানদের দেখাশুনা ও শরীর চর্চার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী ও শিক্ষক এসে বললো, আমি আপনার সন্তানদেরকে অমুক জলাশয়ে নেমে সাঁতার শিখতে বলেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাতে নেমে সাঁতার না জানার কারণে আপনার অমুক অমুক সন্তান ডুবে মারা গেছে। এ কথা শুনে শিক্ষককে বলতে লাগলো, তুমি যেহেতু জান, আমার সন্তানেরা সাঁতার জানে না, তারপরও কেন এত গভীর পানিতে তাদেরকে নামতে বললে? তুমি তাদেরকে সাঁতার কাটার জন্য নামিয়ে কোথায় ছিলে? কেন আমার সন্তানদের সাথে তুমি পানিতে নামলে না? শিক্ষক বলল, এটা তো আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। আপনি তো ভালো করেই জানেন সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়।

এতে লোকটি তার উপর প্রচণ্ড রাগান্বিত হলো। সে রাখাল ও ব্যবসায়িক কর্মচারীর উপর যতটা রাগান্বিত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি রাগান্বিত হয়েছিল শিক্ষকের উপর। সে শিক্ষকের উপর এতটা রাগান্বিত হয়েছিল যে, তাকে হত্যা করতে অগ্রসর হলো এবং বাকী দুইজনকে কঠোর শাস্তি দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলো। কেননা তাদের প্রত্যেকেই নিজের দোষ-ত্রুটিকে তাক্বদীরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে যাচ্ছিল ।

এই অবস্থায় তার সেই বন্ধু এগিয়ে এলো, যে তাকে সবসময় স্বীয় কুকর্মে তাক্বদীরের অযুহাত পেশ করতে নিষেধ করতো। বন্ধু এমন একটা সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করছিল। বন্ধু তাকে বললো, আফসোস তোমার জন্য। তুমি কেন এই অসহায় লোকদের উপর এত রাগান্বিত হয়েছো? তারা যখন তাদের অপরাধের উপর তাক্বদীরের দলীল দিচ্ছে, সেটা তুমি মেনে নিচ্ছ না কেন? তুমি তাদের উপর এত বেশি রাগান্বিত হচ্ছ কেন? তুমি তো দীর্ঘদিন যাবৎ তোমার সব অপকর্মের উপর তাদের মতই তাক্বদীরের দলীল দিচ্ছো এবং অপরাধের ময়দানে লাগামহীন ঘোড়া ছুটাচ্ছ? তাক্বদীর দ্বারা দলীল পেশ করে তোমার অপরাধে লিপ্ত হওয়া

যদি সঠিক হয়, তাহলে তাদের অযুহাত সঠিক হবে না কেন? তাদের অযুহাত যদি হাস্যকর ও অযৌক্তিক হয়, তাহলে তোমার অযুহাত হাস্যকর ও অনর্থক হবে না কেন? তুমি কীভাবে এই অপরাধগুলো নিয়ে ক্বিয়ামতের দিন তোমার রবের সামনে হাজির হবে? তোমাকে যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, এগুলো কেন করেছো তখন তুমি যদি তাক্বদীরের অযুহাত পেশ করো, তাহলে কি আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন?

বন্ধুর এহেন কথা শুনে লোকটি তার সুবুদ্ধি ফিরে পেলো এবং গাফলতির গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলো। সে তাৎক্ষণিক বলতে লাগলো, আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি তোমার মাধ্যমে আমাকে হিদায়াত করেছেন এবং আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মুছীবতকেই আমার জন্য উপদেশ বানিয়েছেন। এতদিন পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, অশ্লীল ও পাপাচারের উপর তাক্বদীরের দলীল দেয়াটা আমার জন্য শোভনীয় ও যৌক্তিক ছিল না। আমি এখন যেই সত্যের সন্ধান পেয়েছি এবং আল্লাহর যেই নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি, তা আমার কাছে আমার মুছীবতের চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহ তা'আলা ঠিকই বলেছেন,

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

"তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা এমন জিনিসকে পছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন। কিন্তু তোমরা জানো না। (সূরা আল বাকারা ২:২১৬)[৯৯]

সমাপ্ত

৬ই রজব, শুক্রবার, ১৪৪২ হিজরী

[৯৯] দেখুন: দুররাতুল বাহিয়া, তারীকুল হিজারাতাইন, পৃষ্ঠা নং ১৫৭-১৬৩।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা

-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম'আতুল ই'তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৭. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৯. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১০. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

১১. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১২. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১৩. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৪. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৫. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৮. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৯. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৩. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৪. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৫. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৬. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৮. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩০. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩১. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩২. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৩. মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৪. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৫. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩৬. ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৭. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]